নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ৬

সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

সম্পাদক

হাসান শরীফ আহমেদ

সম্পাদনা পরিষদ

সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, সাদিয়া এ চৌধুরী
কানিজ ফাতেমা ও মু. গোলাম সাত্তার

ব্র্যাক

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল :সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী
ঢাকা ১২১২

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১২১২

১৯৯৬-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ২৬টি এবং ১৯৯৭-এর ৪টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 1996, Number 6, September 1998. Published by the Research and Evaluation Division, BRAC, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

নির্যাস পাঠক জরিপ: মাঠ পর্যায়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ১

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

- ব্র্যাকের মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন ৩
- ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প: পরিবেশগত একটি সমীক্ষা ৮
- মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এ আরডিপি'র ঋণ বিতরণের চিত্র ১২
- ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা ১৪
- আরডিপি'র মাসিক সভা: মতলবের দশটি গ্রাম সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ১৭
- পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল: ব্র্যাক কর্মসূচিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় ২১
- গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা ২৩
- ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে জটিলতা: একটি সমীক্ষা ২৫
- ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েদের অর্জিত মৌলিক দক্ষতার মূল্যায়ন ২৯
- গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার: ব্র্যাকের ভূমিকা ৩৩
- গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা: একটি সমীক্ষা ৩৫
- ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পুনর্ব্যবহার: একটি সম্ভাব্যতা যাচাই ৩৭

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

- জাতীয় টিকা দিবসের সংগঠন এবং বাস্তবায়ন: ১৯৯৬ পর্বের একটি মূল্যায়ন ৩৯
- বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচির মূল্যায়ন ৪২
- ব্র্যাকের এআরআই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ ৪৪
- মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা ৪৮
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডকৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন ৫২
- প্রসব-পূর্ব সেবায় কর্মসূচি সংগঠকের ভূমিকা ৫৪
- পরিবার পরিকল্পনা: একটি সমীক্ষা- গ্রামের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর ধারণা ৫৬
- গ্রামীণ এলাকায় প্রসব পরবর্তী সময়ে জন্মনিরোধক ব্যবহারের ধরন ৫৮
- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা ৬০
- বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব ৬২
- পুষ্টি উন্নয়নে পরিপূরক খাবার: মুক্তাগাছা পাইলট প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন ৬৪
- পরিপূরক খাবার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা: মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের একটি পাইলট সমীক্ষা ৬৬

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ল্যাট্রিন বিক্রয় কতটুকু ফলদায়ক? ৬৮
- অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা ৭০

ব্র্যাকের উলেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৭-৯৮)

- দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন: ব্র্যাকের পলী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন ৭২
- আর্সেনিক পরীক্ষায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী ৭৫
- ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ নির্গমন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা ৭৮
- ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকারিতা ৮০
- নির্যাসের পূর্ববতী খণ্ডসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ ৮১

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, ঋণদান, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি আজ সুদূর পল্লীতে পৌঁছে গেছে। সকল গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর বিকাশ, সম্প্রসারণ, বাস্ত বায়ন ও মূল্যায়নের জন্য ব্র্যাক গবেষণাকে সম্পৃক্ত করেছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। তাই ব্র্যাকে ১৯৭৫ এ গঠিত ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান ইউনিট আজ এক পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষ গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ। এ বিভাগ এ পর্যন্ত প্রায় ৬শত গবেষণা প্রবিবেদন প্রকাশ করেছে যার অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার গবেষক, বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণও যাতে এ সকল গবেষণার ফলাফল থেকে লাভবান হতে পারেন সে জন্যই এ প্রতিবেদনগুলোর সার-সংক্ষেপ বাংলায় 'নির্যাস'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এটা নির্যাসের ৬ষ্ঠ খণ্ড। ১৯৯৬ এ পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনগুলো থেকে বাছাইকৃত কতিপয় প্রতিবেদন ও ১৯৯৭-৯৮ এর উল্লেখযোগ্য চারটি প্রতিবেদনের মূল ফলাফলসমূহসহ মোট ৩০টি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি সমাপ্ত এই চারটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা না করে এই সংখ্যায় অন্তর্ভূক্তির একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, নির্যাসের পাঠকদের আমরা দ্রুত গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো জানাতে চাই। আর্সেনিক দূষণের উপর যে রিপোর্টটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা জনগুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এ বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন এবং মাঠ পর্যায়ে যারা কর্মরত আছেন তাদের এ প্রতিবেদনটি কাজে লাগবে আশাকরি।

নির্যাস প্রকাশনার পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্র্যাকের মাঠ কর্মীগণ নির্যাসের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে কিনা, হলে কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন, কিংবা তারা নির্যাস ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা অথবা নির্যাস পড়ার অবসর তারা পাচ্ছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য সম্প্রতি একটি পাঠক জরিপ শেষ হয়েছে। আমরা এ জরিপে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। আগামী সংখ্যায় এ জরিপের বিস্তারিত ফলাফল আপনাদের জানাতে পারবো বলে আশা করছি। তবে এ সংখ্যায় আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ফলাফলের কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে পরবর্তী নিবন্ধে।

নির্যাস প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে নির্যাসকে আরো সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের কাছ থেকে অব্যাহত পরামর্শ ও সমালোচনা আশা করছি।

নির্যাস সম্পর্কে আপনাদের যে কোন মূল্যবান সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক

নির্যাস পাঠক জরিপঃ মাঠ পর্যায়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

হাসান শরীফ আহমেদ ও এ কে এম আহসান উলাহ

নির্যাস ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা। ১৯৯৫ সাল থেকে নির্যাস প্রকাশিত হয়ে আসছে। ব্র্যাক বিশ্বাস করে উন্নয়নের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ, উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকাশ ও সম্প্রসারণে গবেষণা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। তাই ১৯৭৫ সালে সূচনা হয় ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগের। এ বিভাগ আজ পর্যন্ত প্রায় ছয়শত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এই গবেষণা প্রতিবেদনের প্রায় সবগুলোই দীর্ঘ ও ইংরেজি ভাষায় লেখা। ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণও যাতে গবেষণার ফলাফল থেকে লাভবান হতে পারেন এজন্য নির্যাস প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইংরেজি ভাষায় লিখিত এ গবেষণা প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তাকারে ও সাবলীল ভাষায় অনূদিত একটি রূপই হল নির্যাস। আজ এই তিন বছরে নির্যাসের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাই আজ সময় এসেছে – নির্যাস মূলতঃ যাদের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে তাদের কাছে পৌঁছে কিনা, পৌঁছলে নির্যাস তারা পড়েন কিনা, পড়লে কেমন লাগে, তারা নির্যাসের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় জানার। তাছাড়াও নির্যাসের মান উন্নয়নের জন্য আরো কোন পদক্ষেপ নেয়া যায় কিনা ইত্যাদি মতামত গ্রহণের জন্য এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়।

এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ব্র্যাকের ১০৩টি এলাকা অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে অফিসগুলোতে যাদের পাওয়া গেছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং এভাবে ৪৯৭টি প্রশ্নপত্র পূরণ করে হাতে হাতে আনা হয়। যাদেরকে অফিসে পাওয়া যায়নি তাদের জন্য প্রশ্নপত্র রেখে আসা হয়। কুরিয়ার কিংবা ডাকযোগে ১,২০১টি প্রশ্নপত্র আসে। সর্বমোট ১,৬৯৮টি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়।

দেখা গেছে, অনেক এলাকা অফিসে নির্যাস ঠিকমত পৌঁছে না। যে সকল এলাকা অফিসে নির্যাস পৌঁছে সে সকল অফিসের কর্মসূচি সংগঠকগণ (পিও) অভিযোগ করেছেন যে, নির্যাস সম্পর্কে তারা জানেন কিংবা ব্যবস্থাপকের কাছে দেখেছেন কিন্তু তাদেরকে দেয়া হয় না। বেশিরভাগ পিও জানেনেই না যে, নির্যাস তাদের জন্যও পাঠানো হয়। বেশ কিছু এলাকা অফিসে দেখা গেছে, এলাকা ব্যবস্থাপকগণ নির্যাসের কপি নিজ বাসস্থানে কিংবা নিজস্ব ড্রয়ারে বা আলমিরাতে স্বযত্নে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। যারা নির্যাস দেখেছেন কিংবা পেয়েছেন অথচ পড়েননি তারা সময় পান না বলে জানিয়েছেন। তবে তাদের অধিকাংশই নির্যাস ছাড়া অন্যান্য ম্যাগাজিন পড়ে থাকেন। নির্যাস পড়তে ভাল লাগে না – এ কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

দাশুড়িয়া, হয়বতপুর ও কাঠালতলী এই তিনটি এলাকা অফিসে মোট ৮২ জন পিওদের নিয়ে ৩টি দলীয় আলোচনা করা হয়। তারা জানান, নির্যাসের মাধ্যমে এক কর্মসূচিতে কাজ করা সত্ত্বেও অন্য কর্মসূচি সম্পর্কে জানা যায়। তারা জানান, মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। নির্যাস তাদেরকে এ সকল প্রশ্নের জবাব দিতে সহায়তা করতে পারে। অনেকেই উল্লেখ করেছেন, নির্যাস সংরক্ষণ করার মত একটি বই। তারা নির্যাস অব্যাহতভাবে প্রকাশের অনুরোধ জানান এবং তাদের কাছে যাতে নির্যাস নিয়মিত পৌঁছে তা নিশ্চিত করার আহবান জানান।

নির্যাস যারা পড়েছেন তাদের প্রায় সকলেই বলেছেন নির্যাস ভাল লেগেছে। একটু কঠিন লেগেছে কেউ কেউ তাও বলেছেন। সিংরা এলাকা ব্যবস্থাপক এক কথায় বলেছেন, "চমৎকার – নির্যাস চমৎকার একটি প্রকাশনা।"

এনএফপিই কর্মীদের মধ্যে নির্যাসের পাঠকের হার বেশি পাওয়া গেছে। আরডিপি'র পিওদের ধারণা এনএফপিই কর্মীদের পড়ার সময় আছে কিংবা তারা পড়াশুনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় নির্যাস পড়তে পারেন।

দু'টি বিষয় লক্ষণীয় ছিল যে, অধিকাংশ মাঠকর্মীরা নির্যাস পান না। আর যারা পান তাদের অধিকাংশই সময়ের অভাবে পড়তে পারেন না, যদিও নির্যাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন। নির্যাস-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ত্বরিত জানার জন্য বেশ কয়েকজন এলাকা ব্যবস্থাপক একই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারা মনে করেন, পিওদের সাপ্তাহিক সভায় নির্যাস নিয়ে একটি এজেণ্ডা রাখা যেতে পারে। আবার এক একজনকে দু'তিনটি নিবন্ধ পড়ে তার ফলাফল সভার মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দিলে সকলেই সজলেই নির্যাস সম্পর্কে জানতে পারবে। এলাকা ব্যবস্থাপকসহ প্রায় সকল পিওগণই একাধিক সংখ্যক নির্যাস পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রকাশনার তিন বছরের মধ্যে যখন পাঁচটি খণ্ড বেরিয়ে গেছে তারপরেও যখন ৩/৪ বছরের পুরাতন কর্মীগণও বলেন, নির্যাস পাইনি কিংবা দেখিনি, নির্যাস সম্পর্কে শুনেছি, তখন ঠিকই মনে হয় নির্যাস বন্টন ব্যবস্থায় বড় ধরনের কোন ত্রুটি রয়েছে – যার আশু সমাধান কামনা করেছেন মাঠকর্মীগণ। অথবা এমনও হতে পারে যে, এলাকা অফিসে নির্যাস পৌঁছেছে ঠিকই কিন্তু কেউ (ব্যবস্থাপক বা যেকোন পিও) পড়তে নিয়ে গেছে এবং পড়ার পর আর ফেরত দেয়নি। কাজেই ঐ এলাকা অফিসে অন্য কারও আর দেখার সুযোগই হয়নি।

অতএব, এই জরিপের ফলাফল বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পূর্বে আমাদের সরাসরি আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের আলোকে এ মুহূর্তে এটুকু বলা যায়। যে,

১। নির্যাসের বন্টন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে একটি যথার্থ বন্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রতিটি এলাকা অফিসে নির্যাস পৌঁছানো নিশ্চিত করা যাবে।

২। নির্যাস পড়ার ব্যাপারে এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে সকল মাঠকর্মীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এলাকা ব্যবস্থাপকগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। সাপ্তাহিক মিটিং-এ নির্যাস একটি নিয়মিত এজেণ্ডা হতে পারে।

৩। নির্যাস শুধু এলাকা ব্যবস্থাপকের জন্যই নয়, এটা ব্র্যাকের সকল মাঠকর্মীদের জন্যই – এ তথ্য ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য মাঠকর্মী সবাইকে জানাতে হবে।

৪। নির্যাসের কলেবর ছোট করে বছরে ৩/৪টি ইস্যু প্রকাশ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ব্র্যাকের মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব ঃ একটি মূল্যায়ন[১]

মোহাম্মদ রফি, ডেভিড হিউম, শাহ আসাদ আহমেদ ও মোহাম্মদ নূরুল আমিন

প্রশিক্ষণ ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্র্যাক প্রশিক্ষণকে শুধুমাত্র গুরুত্বই দেয় না, এই খাতে প্রচুর বিনিয়োগও করেছে। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সাথে ব্র্যাক তার জন্যলগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। ১৯৮১ সালে ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ বিভাগের মোট খরচের পরিমাণ যেখানে ছিল মাত্র ২১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, তা ১৯৯৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকায়। এ ছাড়াও ব্র্যাকের বিভিন্ন বিভাগ স্বউদ্যোগে কিছু কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ খাতে এই বিপুল ব্যয় কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কর্মসূচি গ্রহীতাদের উপর এই প্রশিক্ষণের কী প্রভাব পড়েছে তা দেখার জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ গবেষণাটি হাতে নেয়। আমাদের জানা মতে প্রশিক্ষণের প্রভাব দেখার কোন স্বীকৃত পদ্ধতি না থাকার কারণে প্রথমেই প্রশিক্ষণের প্রভাব নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। উদ্ভাবিত এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা (এইচআরএলই) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়।

ব্র্যাকের সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রয়োজনীয় আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। কম খরচে অধিক সংখ্যক সদস্যদের মাঝে যেন এই আইনি জ্ঞান পৌঁছে দেয়া যায় সেভাবেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।

তিনটি পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়, যথাঃ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, আইন শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং সেবক/সেবিকার মাধ্যমে সদস্যদের প্রশিক্ষণ। এই কর্মসূচি মুসলিম পারিবারিক আইন, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, ভূমি আইন ও নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন – এই চারটি আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়।

এই গবেষণার একটি চ্যালেঞ্জ ছিল যে, কতটা মাত্রায় এইচআরএলই প্রশিক্ষণ তার মূল উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করছে তা দেখা। সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ধরন; প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও প্রদান; প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং সদস্যদের জ্ঞান, মনোভাব, আচরণ ও কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণের প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

---

[1] "Impact assesment of BRAC's human rights and legal eduation training." শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন হাসান শরীফ আহমেদ ও শাহ আসাদ আহমেদ

প্রশিক্ষণের মেয়াদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনাকে মূল্যায়ন করার সময় দেখা হয়েছে যে, প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অংশ প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে কতটা সহজ বা কঠিন, এবং প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অংশ কতটা প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, আইন শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণের সেশনগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। উপরন্তু, ৭৫ জন সদস্যা যারা এক থেকে তিন বৎসর পূর্বে আইন শিক্ষা লাভ করেছিলেন, আরো ৭৫ জন সদস্য যারা আইন শিক্ষাা লাভ করেননি এবং অন্য ৫০ জন যারা ব্র্যাকের কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত নন তাঁদেরকেও এই গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আইন সম্পর্কিত ঘটনা তলিয়ে দেখার জন্য ১৪ জনকে পরীক্ষামূলক দল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেছে নেয়া হয়।

মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব

মানবাধিকার আইন শিক্ষা কর্মসূচি ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে এক লক্ষ গ্রামবাসীকে আইন শিক্ষা প্রদান করেছে। ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে প্রায় ২,৯১,০০০ সদস্য আইন শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং আশা করা হচ্ছে এ শতাব্দীর শেষে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে দশ লক্ষে। বেশির ভাগ আইন শিক্ষার শিক্ষক এবং সদস্য প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের সময়কাল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও প্রায় অর্ধেক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন।

যদিও মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সাথে গ্রাম সংগঠনের সদস্যবৃন্দের চাওয়া-পাওয়ার সামঞ্জস্য রয়েছে কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যতা মেলে না। যেমন, মুসলিম পারিবারিক আইন নাগরিক অধিকার রক্ষা আইনের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত হয়।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে, যেমনঃ ব্যাখ্যা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং মুখস্থ বিদ্যা। প্রশিক্ষণের এইসব কৌশল আহরিত জ্ঞানকে আয়ত্ব করা এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে। দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণগুলো ছিল অংশগ্রহণমূলক ও সহজবোধ্য।

আইন প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন যথার্থ ছিল। সদস্যদের অনেকেই নিজ উৎসাহে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। অল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী চাপের মুখে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের উপর ভবিষ্যতে ঋণ পাওয়া নির্ভর করে। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের অজান্তেই প্রশিক্ষণের ফী আরডিপি'র ঋণ থেকে কেটে নেয়া হয়েছে।

দেখা গেছে, বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণে আইন শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত সাফল্যজনক ছিল। সদস্য প্রশিক্ষণার্থীগণ মুসলিম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন ছাড়া বাকী সকল আইনের ক্ষেত্রে সাফল্যজনকভাবে শিক্ষা লাভ করেছে। এটাও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক দক্ষতা অর্জন করেছেন।

ব্র্যাকের সদস্যদের আইন বিষয়ক জ্ঞান এই প্রশিক্ষণের পূর্বে ব্র্যাকের অসদস্য গ্রামবাসীদের মতই ছিল। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ শেষে আইনি জ্ঞান অনেক বেড়ে যায় (৩৯% থেকে ৮১%)। ধারণা করা হয়েছিল যে, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান সময়ের সাথে সাথে কমতে থাকে। কিন্তু প্রশিক্ষণের প্রায় তিন বছর পরও তাদের জ্ঞান যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি তাদের চেয়ে অনেক (১০%) বেশি ছিল।

দেখা গেছে, গত তিন বছরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের অধিকাংশ (৬১%) যারা প্রশিক্ষণ পায়নি এমন সদস্যদের কিছু সংখ্যক (১২%) এবং ব্র্যাক কর্মসূচি বহির্ভূতদের কিছু সংখ্যক (৪%) মানবাধিকার ও অন্যান্য আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ড চালিয়ছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগ কর্মকাণ্ডই মুসলিম পারিবারিক আইন নিয়েই কাজ হয়েছিল।

আরো দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাদের জীবনে সংঘটিত তিন-চতুর্থাংশ (৭৭%) প্রাসঙ্গিক ঘটনার ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছেন। মানবাধিকার ও আইন শিক্ষার জ্ঞান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল বাধা হল যে, তারা গরীব বলে সমাজে তাদের কোন প্রভাব নেই এবং গ্রামের নেতাগণ পরিচালিত গ্রাম্য আদালতেও কোন প্রভাব নেই। উল্লেখ্য, এ সকল গ্রাম্য আদালতের রায়ে প্রায়শই আইনের প্রয়োগ দেখা যায় না।

উপসংহার

ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে এইচআরএলই প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ বিভাগ যে ধারায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে তা অত্যন্ত কার্যকরী। প্রশিক্ষণের ফলে তাদের আইনি জ্ঞান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সময়ের সাথে সাথে এই অর্জিত জ্ঞান কমতে থাকে কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, প্রশিক্ষণের তিন বৎসর পরেও তাদের এ জ্ঞান তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল ছিল।

এইচআরএলই কর্মসূচি প্রশিক্ষণার্থীদের মনোভাবেও পরিবর্তন এনেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে মানবাধিকার ও অন্যান্য আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ বেড়েছে। আইন শিক্ষা গ্রহণকারী সদস্যগণ আইন সংক্রান্ত অধিকাংশ সমস্যা সমাধানে তাদের এ প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও এই প্রশিক্ষণের বিভিন্ন স্তরে কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল।

সুপারিশমালা

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির চতুর্থ পর্যায়ে মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা যথার্থ। আইন শিক্ষার প্রশিক্ষণার্থীগণ বিশেষ করে অইন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দের জন্য কম খরচে এবং কম সময়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে আবার এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, সময়ের সাথে সাথে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কমতে থাকে।

নাগরিক অধিকার রক্ষা আইনের উপর কম সময় ব্যয় করে প্রশিক্ষণকে আরও স্বল্পমেয়াদী করা যেতে পারে। মুসলিম পারিবারিক আইনের বিষয়বস্তু বাড়ানো, সহজ ও বোধগম্য করা যায় কিনা তা পুনঃ বিবেচনা করা যেতে পারে।

সেবক/সেবিকাগণ যেসব ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করে থাকেন তা আরও বড় আকারের করা যেতে পারে যাতে প্রশিক্ষণার্থী একটু দূর থেকে তা ঠিকমত দেখতে পারেন।

ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকগণ এবং সেবক/সেবিকাগণ যেন অবশ্যই এটা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন যে, যে আইন শেখানো হচ্ছে তা বাংলাদেশের আইন-খ্রীস্টানদের আইন বা ব্র্যাকের আইন নয়। ফ্লিপ চার্টের প্রচ্ছদে বাংলাদেশের পতাকা রাখা যেতে পারে।

এ প্রশিক্ষণ খোলা মাঠে না করে ঘরের ভিতর করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের বাচ্চাদের বিনা খরচে কিংবা কম খরচে নিরাপদে রেখে যাতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি শিশু কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। যে সকল সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন না তারা এইসব কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারেন।

সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণের জন্য জোরপূর্বক তালিকাভুক্ত করা না হয় সেদিকে নজর দেয়া উচিত। বরং আইন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সদস্যদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে তারা স্বেচ্ছায় এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে প্রশিক্ষণের একটি নির্দিষ্ট ফী (দশ টাকা) কেটে নেওয়া হয়। তাই নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক যে, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে।

আইন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কিভাবে আরও কার্যকরী করা যায় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য উচ্চ পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা যায়। এছাড়াও নিম্নোক্ত বিকল্প উপায়সমূহ বিবেচনায় আনা যায়, যেমনঃ

(১) আইন বাস্তবায়ন কমিটিগুলোকে সামাজিক এ্যাকশন কমিটিতে রূপান্তরিত করা, যার কাজ হবে গ্রাম পর্যায়ে মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা সম্পর্কিত ঘটনাবলী গ্রাম সংগঠনের মাসিক সভায় উপস্থাপন করা।

(২) সদস্যবৃন্দ যাতে গ্রাম্য আদালতে আইনসম্মত অংশগ্রহণকারী বলে স্বীকৃত হয় তা নিশ্চিত করা।

(৩) গ্রামের নেতা এবং তাদের প্রতিনিধিদের এইচআরএলই প্রশিক্ষণ দেয়ার নতুন যে উদ্যোগ নেয় হয়েছে তার কার্যকারিতা কতটুকু তা মূল্যায়ন করা।

(৪) মহিলাদের অধিকার আদায়ে আন্দোলনরত দলের সাথে সংগঠনের সদস্যদের যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে, যাতে তারা আইন শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা পায়।

(৫) মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলার জন্য গণমাধ্যমের ব্যবহার করা।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে যা পরবর্তীতে অন্যান্য প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প ঃ পরিবেশগত একটি সমীক্ষা[২]

ফারিয়া জামান, নাসিমা আকতার, জেনভিয়েভ চিকোয়ান ও মো. যাকারিয়্যা

ব্র্যাকের পরিবেশ গ্রুপের সূচনা হয় ১৯৯৬ সালের জানুয়ারীতে। এরপর থেকে এই গ্রুপ পরিবেশ গবেষণার ক্ষেত্র (ব্র্যাকের কর্মসূচির মধ্যে) চিহ্নিত করার জন্য ব্র্যাকের কিছু কার্যক্রমের প্রাথমিক পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ (IEE-Initial Environmental Examination) করে। এর মধ্যে ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এটি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের একটি সমীক্ষা যার জন্য ব্র্যাকের বন, রেশম, কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রকল্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ সমীক্ষা চলে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মানিকগঞ্জ, বগুড়া ও খুলনা এই তিনটি এলাকা বাছাই করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ব্র্যাকের সদস্য, উক্ত কর্মসূচির সেক্টর স্পেশালিষ্ট, আঞ্চলিক ও এলাকা ব্যবস্থাপকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। কর্মীদের অনুপস্থিতিতে সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় যাতে কোন কর্মীর উপস্থিতি তথ্যে প্রভাব না ফেলে।

ফলাফলে দেখা যায়, মানিকগঞ্জ ও বগুড়ার চেয়ে খুলনায় বনায়ন কর্মসূচি অধিকতর ভাল। বগুড়ায় রাস্তার ধারে তুঁত গাছ লাগানো হয়েছে তবে তা একটি ফলপ্রসূ বনায়ন কর্মসূচির জন্য যথেষ্ট নয়। রাস্তার ধারে বনায়ন কর্মসূচি মূলতঃ তুঁত গাছ লাগিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আর এ কাজ প্রধানতঃ মহিলারাই করছেন। বনায়ন কর্মসূচিতে সদস্যগণ খুব একটা আগ্রহী নয় বলে মনে হয় কারণ এতে দ্রুত কোন লাভ পাওয়া যায় না। রেশম প্রকল্পে দেখা গেছে যে, তারা রং ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে যা প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এখানে ফরমালিন ব্যবহার করা হয় যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (এই ফরমালিন যেখানে ফেলা হচ্ছে সেখানকার উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার বিভিন্ন জীবের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে)। রিলিং এর গরম পানি অনেক সময় হাতের ক্ষতি করে।

কৃষি কর্মসূচিতে দেখা যায়, সদস্যগণ মাঠে ব্যাপকভাবে জৈব সার ব্যবহার করে না। তারা প্রধানতঃ রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে যা পরিবেশ, প্রাণীজগৎ, এমনকি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে খুব একটা সচেতনতা বা সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা যায় না।

দেখা যায়, যে পুকুরে মাছ চাষ করা হয় সেই পুকুরের পানি দিয়ে গোসল, রান্না, হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়, যা মৎস্য চাষ প্রকল্পের জন্য ক্ষতিকর। মাছ চাষের পুকুর তৈরি করার জন্য পুকুরে বিষ

[2] "Initial Environmental Examination of BRAC Programmes: agriculture, fisheries, forestry, sericulture" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (মে ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ

দেয়া হয়, যাতে রাক্ষুসে মাছ মারা যায়। এতে অনেক উপকারী উদ্ভিদ, পোকা-মাকড়ও মারা যায়। সদস্যগণ সেই বিষাক্ত মৃত মাছ খেয়ে থাকে এবং বাজারেও বিক্রি করে থাকে। এতে করে জনস্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে পুকুর পাড়ে সবজি চাষ জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে সদস্যগণের আয় বেড়েছে।

পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ

বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য পৃথকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। বনায়ন কর্মসূচির জন্য যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে তা হলঃ

- দেশীয় উন্নত জাতের পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহ করতে হবে, নার্সারীতে পলিথিনের ব্যবহার কমাতে হবে।
- গাছের চারা বিপণনের সুবিধা বাড়াতে হবে, সামাজিক বনায়নের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, পতিত জমির সর্বাধিক ব্যবহার ও রাস্তার ধারের গাছগুলির প্রতি অধিকতর খেয়াল রাখতে হবে।
- দেশীয় প্রজাতির গাছ রোপণ করতে হবে ও গাছ রোপণে বৈচিত্র্য থাকতে হবে।

দ্রুত বর্ধনশীল রেশম প্রকল্পের জন্য যে সুপারিশগুলো এসেছে তা হলঃ

- কর্মীদেরকে গ্লাভস দিতে হবে।
- কাজ করতে গিয়ে ছোট-খাট দুর্ঘটনার জন্য কর্মীদের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- মাটির বহুবিধ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জাতের গাছ রোপণ করতে হবে ও ককুন থেকে যে প্রাকৃতিক কেমিক্যাল আসে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- মরা ককুন ও ব্যবহৃত ককুন-এর সার, মুরগী বা মৎস্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৃষি কর্মসূচির জন্য সুপারিশ হল

- কর্মী ও সুবিধাভোগীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন সব কেমিক্যাল ব্যবহার করেন।
- বিভিন্ন কীটনাশকের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

- কীটনাশকের পরিবর্তে বিকল্প কিছু ব্যবহার করতে হবে, যেমন প্রাকৃতিক উপায়ে কীটপতঙ্গ দমন করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ।

- ভাল জাতের বীজ বপণ ও যথাযথ সেচ ও সার ব্যবহার করতে হবে যাতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়।

মৎস্য প্রকল্পের জন্য সুপারিশসমূহ হল

- যে পুকুরের মৎস্য চাষ করা হবে সে পুকুর মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

- পুকুর তৈরিতে বিষের ব্যবহার পরিহার করে অন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যেমনঃ নেটিং, শুকানো ইত্যাদি।

প্রত্যেক কর্মসূচির ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছে

<u>পরিবেশগত বনায়ন কর্মসূচি</u>

- জীব বৈচিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রজাতির উপর জরিপ চালানো প্রয়োজন।

- পলিথিনের বিকল্প কিংবা পলিথিন ব্যবহার হ্রাস, ইত্যাদি বিষয়ের উপ সমীক্ষা চালানো প্রয়োজন। বিভিন্ন এলকার জন্য সেই এলাকার স্থানীয় প্রজাতির গাছ সনাক্তকরণ।

<u>রেশম চাষ প্রকল্প</u>

- রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর কি প্রভাব ফেলে তা দেখা আবশ্যক।

- ফরমালিনের ব্যবহার পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা দেখা প্রয়োজন।

- ককুন থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ বের হয় তার ব্যবহার ও প্রভাব উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। সার হিসাবে বর্জ্যের ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক।

<u>কৃষি প্রকল্পের জন্য সুপারিশ</u>

- খুব কমই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। তাই কার্যকরী কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এমন কৌশল উদ্ভাবন আবশ্যক যা পরিবেশের জন্য বিপদজনক নয় – এমনকি সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর নয়।

- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নয় এমন নতুন আবিস্কৃত জৈব সার বিষয়ে আরো গবেষণা আবশ্যক।

- মাটি ও ফসলের মাঠ নষ্ট করে এমন কীটনাশকের প্রভাব পরিমাপ করার জন্য গবেষণা প্রয়োজন।

- বিকল্প বা পরিবেশগত কৃষির উপর গবেষণা প্রয়োজন।

মৎস্য প্রকল্পের জন্য সুপারিশ

রাক্ষুসে মাছ মারার জন্য পরিবেশের ক্ষতিকারক নয় এমন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে হবে। বাজারজাতকরণের জন্য ভাল ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উৎপাদনকারী সর্বাধিক লাভবান হয়। মাছের মড়ক রোধে সম্ভাব্য পদক্ষেপ কি হতে পারে তা নিয়ে ভাবা দরকার। দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষে উৎসাহিত করার জন্য গবেষণা প্রয়োজন। মৎস্য প্রকল্পে ব্যবহৃত কীটনাশক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য গবেষণা প্রয়োজন।

মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এ আরডিপি'র ঋণ বিতরণের চিত্র[৩]

সাহেদ হোসেন ও ক্যারেন মুর

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) ১৯৬০ এর গোড়ার দিক থেকেই এদেশে কলেরা ও ডায়রিয়ার উপর গবেষণা চালিয়ে আসছে। চাঁদপুর জেলার মতলবে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটির মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুপরিচিত। গবেষণার সুবিধার্থে তাদের রয়েছে বিশাল ডাটা ব্যাংক। এই বিশাল তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের বিভিন্ন তথ্য যেমন – জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি, জন্মশীলতা, আয়, ক্ষমতায়ন, অক্ষরজ্ঞান ইত্যাদি। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) ব্র্যাকের প্রধান কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম। ব্র্যাক ১৯৯২-এ মতলবে আরডিপি'র একটি শাখা খোলে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ শুরু করে। ফলে অত্র এলাকায় গবেষণার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি একত্রে একটি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়। ব্র্যাকের সূচিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অত্র এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও সার্বিক উন্নয়নের কতটা প্রভাব ফেলে তা এ থেকে বোঝা যায়।

ব্র্যাক প্রথমে দরিদ্র জনগণকে নিয়ে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলে। প্রতি সংগঠনে ২০-৪৫ জন সদস্য নেয়া হয়। বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন তাদেরকে পরে ঋণ দেয়া হয়। মতলব এলাকায় ঋণ বিতরণের ধরন, ঋণের পরিমাণ এবং সদস্য বৃদ্ধির ধরণ দেখাই এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

চাঁদপুর জেলার একটি বৃহত্তম থানা মতলব। বর্ষা মওসুমে মতলবের বেশির ভাগ অঞ্চল প্লাবিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৮৬ সালে নির্মিত হয় বাঁধ। এ এলাকার অধিকাংশ লোক কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ নিজের জমি চাষ করে, কেউ বর্গচাষী, আবার অনেকে শ্রমজীবী। ব্র্যাক এই এলাকায় ১৯৯২ সাল থেকে তার কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৯৬ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ৬৬টি গ্রাম এর আওতায় নিয়ে আসে।

মতলবে ১৯৯৫-এর শেষের দিকে ১৪১টি গ্রাম সংগঠনে মোট ৫,৬৫৩ জন সদস্য ছিল অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি সংগঠনে ৪০ জন। এই সংখ্যা ব্র্যাকের অন্যান্য এলাকার সংগঠনের সদস্যদের প্রায় সমান। এ এলাকার ১৪১টি সংগঠনের একটি বাদে সবগুলোই মহিলাদের নিয়ে গঠিত। তিন বছর বয়স হয়েছে এমন সব এলাকা অফিসের মধ্যে ১৯৯৪ এ মতলবে সবচেয়ে কম সংখ্যক সদস্য ছিল। তবে ১৯৯৫ এর প্রথম দিক থেকে এ সংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্য সংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেখা গেছে কর্ম এলাকা ও এরিয়া অফিসের মধ্যে পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না।

মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এর মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে শতকরা ৪৪ ভাগ ঋণ কৃষি খাতে বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে সেইসব খাতে যেখানে ব্র্যাক কোন প্রশিক্ষণ দেয়নি। ঋণের

[3] "Features of laon disbursement at Matlab RDP during 1992-1995" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নূরজাহান আকতার সেতু।

বেশিরভাগই ব্যবহৃত হয়েছে টমেটো ও ধান চাষের জন্য। রবি শস্যের জন্যও কিছু ঋণ ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে, শতকরা ২৬.৭ ভাগ ঋণ ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য বিতরণ করা হয়। এ ব্যবসা বলতে মূলতঃ শাক-সবজি, ফল-মূল বিক্রয়কে বোঝায়। প্রায় ৯.৮ ভাগ ঋণ রিক্সা কিংবা নৌকা ক্রয়ের জন্য বিতরণ করা হয় এবং শতকরা ২.৯ ভাগ ঋণ মাছ চাষের জন্য বিতরণ করা হয়। বাড়ী নির্মাণ কিংবা মেরামতের জন্যও শতকরা প্রায় ৪.৮ ভাগ ঋণ বিতরণ করা হয়।

মতলব এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ব্র্যাকের ঋণ বেশি দেয়া হয়েছে। এরপর রয়েছে কৃষি খাত, বাড়ি নির্মাণ অথবা মেরামত, ও গবাদি পশু পালন। ১৯৯২-৯৫ এ ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ পূর্বের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে মতলব এলাকায় আয়-উপার্জনের উৎস হিসাবে কৃষিকাজ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার গুরুত্ব বোঝা যায়।

মতলবের এরিয়া অফিসে ১৯৯২-৯৫ এ কোন অপরিশোধিত ঋণ ছিল না যদিও সামান্য কিছু ঋণ বিলম্বে শোধ করা হয়েছে। এ দিক থেকে এটি ছিল একটি সফল এলাকা।

ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা[৪]

শাহনাজ আকতার ও মো. রাফি

গ্রামীণ এলাকার বেশিরভাগ লোক ভূমিহীন এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ নেই। তারা বেঁচে থাকার জন্য ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছেনা। কৃষিখাতে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুঁজি। এই জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পুঁজি যোগান দেয়া যেতে পারে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। স্বাধীনতার পরপরই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্র্যাকের কার্যক্রমের সূচনা। দারিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক তাদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যম কর্মসংস্থান তথা তাদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করছে।

ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালানো হয়। এ সমীক্ষায় জামালপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত তিতপল্লা ইউনিয়ন ও কেন্দুয়া ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত গ্রামগুলোর সমিতিভুক্ত সকল সদস্যের ১৯৯১, ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে ব্র্যাক থেকে গৃহীত সকল ঋণ, ঋণের ব্যবহার, আয়-ব্যয় এবং ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগৃহীত হয়।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় ১৯৯১, ১৯৯২, ও ১৯৯৩ সালে গবেষণাধীন এলাকার ১৫৯টি খানার ২০৫ জন সদস্য ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়েছে। পুরুষের চেয়ে মহিলাদের ঋণ গ্রহণের হার বেশি ছিল। গাভী পালন, মুরগী পালন ও রেশম পোকা পালনের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র মহিলাদের ঋণ দেয়া হয়েছে এবং রিক্সা ও ভ্যান ক্রয় এবং বন্ধকী জমি ছাড়ানোর জন্য পুরুষদের ঋণ দেয়া হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ঋণ নিয়েছে এরকম কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কেবল মাত্র ধানের ব্যবসা ব্যতীত অন্য সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষরাই মহিলাদের চেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ এ ঋণ বিতরণ কম হয়েছে কারণ তখন সমিতির অভ্যন্তরীন কোন্দলের কারণে দীর্ঘ সময় ঋণ বিতরণ বন্ধ ছিল। ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ গ্রহণের হার ১৯৯১ সনে সর্বোচ্চ ছিল (৮৩%), যা পরবর্তী বছরে কমেছে। দর্জির কাজ, মুদী দোকান ও রেশম পোকা পালনের ক্ষেত্রে সবকটি ঋণই ১৯৯৩-এ দেয়া হয়েছিল।

মোট ঋণের ৪০% সম্পূর্ণ উৎপাদনশীল খাতে, ৩৭% আংশিক উৎপাদনশীল খাতে এবং ২৩% সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষদের তুলানায় মহিলারা ঋণের যথাযথ ব্যবহার বেশি করতে পেরেছে। রেশম পোকা পালনের ঘর তৈরির জন্য ঋণ দেয়া হলেও তা বাড়ি বা ভিটে কেনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। মুরগী পালন স্কীমের ৪০% ঋণ আংশিকভাবে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্কীমে মোট গৃহীত ঋণের ২% অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

[৪] ১৯৯৬ সাল সম্পাদিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ।

প্রস্তাবিত স্কীমে ঋণের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে মহিলারা ভাল করেছে। অন্যদিকে ঋণের অর্থ প্রস্তাবিত স্কীম ব্যতীত অন্য উৎপাদনশীল খাতে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি হারে বিনিয়োগ করেছে। সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের ব্যবহার পুরুষদের চেয়ে মহিলারা কম করেছে। ভোগের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ মহিলাদর ক্ষেত্রে ক্রমশঃ কমেছে।

প্রস্তাবিত স্কীম অনুযায়ী বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ মুনাফা (মাসিক ৮০০ টাকা) পেয়েছে মহিলারা ধান ভানা স্কীম থেকে, এক্ষেত্রে পুরুষদের মুনাফার পরিমাণ ৩১৬ টাকা। আবার পুরুষরাও সর্বোচচ মুনাফা পেয়েছে (মাসিক ৭৮০ টাকা) রিক্সা চালনা থেকে। তিনজন মহিলাও প্রস্তাবিত স্কীমে ঋণ ব্যবহার না করে রিক্সা ক্রয় করে স্বামী কিংবা ছেলের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের আয় কম হয়েছে কারণ তার পুরাতন রিক্সা কিনেছেন যার মেরামত খরচ বেশি ছিল এবং অসুস্থ থাকায় রিক্সা চালাতে পারেনি এবং কিছুদিন চালিয়ে রিক্সা বিক্রি করে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি সংখ্যক ঋণ ব্যবহার করেছে কিন্তু পুরুষরা মুনাফা বেশি পেয়েছে।

গাভী পালন স্কীমে বেশিরভাগ মহিলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুরগী পালন স্কীমে ক্ষতি হয়েছে কারণ ব্র্যাক অফিস নির্দিষ্ট সময়ে মুরগী কিনে নেয়নি এবং মুরগীর খাবার সরবরাহ করা হয়নি ফলে তারা স্থানীয় বাজারে কম মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। কৃষিকাজে বিনিয়োগ করে আশানুরূপ মুনাফা পাওয়া যায়নি কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল নষ্ট হয়েছে এবং মাত্র এক মৌসুমের জন্য ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে।

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ঋণ গ্রহীতারা অগ্রিম, নিয়মিত এবং বিলম্বেও ঋণ শোধ করেছে। মোট ঋণের মধ্যে ৮% অগ্রিম শোধ করা হয়েছে, সময়মত পরিশোধ করা হয়েছে ৫১% এবং বিলম্বে শোধ করা হয়েছে ৪১%। ধান ভানা ও ধানের ব্যবসা স্কীমে পুরুষদের ক্ষেত্রে অগ্রিম ঋণ পরিশোধের হার অন্যান্য স্কীম অপেক্ষা বেশি ছিল। মহিলাদের ক্ষেত্রে এ দুটি স্কীমে অগ্রীম ঋণ পরিশোধের হার অনেক বেশি (১৪% ও ৩০%)। মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা ধান ভানা স্কীমে বেশি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা স্কীমে কম হারে ঋণ শোধ করেছে।

প্রথম ঋণের চেয়ে দ্বিতীয় ঋণ এবং দ্বিতীয় ঋণের চেয়ে তৃতীয় ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের হার ভাল ছিল। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ ব্যবহার করে পুরুষ সদস্যরা ঋণের ৩% অগ্রিম, ৪২% নিয়মিত পরিশোধ করেছে এবং মহিলারা ঋণের ৩৫% নিয়মিত পরিশোধ করেছে।

নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং দুর্ঘটনার কারণে পুরুষ ও মহিলাদের নেয়া ঋণের মোট ক্ষতির হার মহিলাদের ঋণের ক্ষতির হার অপেক্ষা বেশি হলেও ব্র্যাকের ব্যবস্থাপনা গত সমস্যার জন্য মহিলাদের ঋণের ক্ষতির হার বেশি। অন্য উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের চেয়ে প্রস্তাবিত স্কীম অনুযায়ী ঋণের ব্যবহারে দুর্ঘটনায় ক্ষতির হার কম দেখা গেছে।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্কীমে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঋণ গ্রহীতারা সবসময় প্রস্তাবিত স্কীমে ঋণ বিনিয়োগ করে না। বরাদ্দকৃত ঋণের ৩১% অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ দরিদ্র জনগণ অনেক সময় পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণের টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হয়।

অন্যথায় সম্পদ বিক্রি করতে হয় কিংবা মহাজনদের মুখাপেক্ষী হতে হয় ঋণের জন্য। প্রস্তাবিত স্কীম ব্যতীত অন্য উৎপাদনশীল খাতে ঋণ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক মুনাফা পেয়েছে মুদীর দোকান থেকে।

ঋণ গ্রহীতাদের মতে, ঋণের উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল উভয় ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'সংসার চালাতে' পেরেছে – এ মতামতটি সর্বাধিক ছিল। তাদের মতে মোট ঋণের শতকরা ১০.৪ ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির কারণসমূহের মধ্যে ছিল ঋণ গ্রহীতার ভুল সিদ্ধান্ত, দুর্ঘটনা এবং ব্র্যাকের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। মহিলা ঋণের ক্ষতির হার পুরুষ ঋণের ক্ষতির হার অপেক্ষা বেশি ছিল। কারণ মহিলারা মুরগী পলন ও গাভী পালন স্কীমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আরডিপি-র মাসিক সভা ঃ
মতলবের দশটি গ্রাম সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ[5]

মাহমুদা রহমান খান

উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে বেশিরভাগ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। ব্র্যাক তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দারিদ্র দূরীকরণ এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন – এ দু'টি মূখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্র্যাক এর উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল বিষয় হচ্ছে এর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি)। আরডিপি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। আরডিপি গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলে যার মাধ্যমে দরিদ্ররা তাদের যৌথ কর্মক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারে। দরিদ্রদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রাম সংগঠনগুলোর মাসিক সভা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির পাক্ষিক সভা আয়োজন করে থাকে।

বিষয়ভিত্তিক সভা এবং স্বাস্থ্য ফোরাম নিয়মিত আয়োজন করা হয়েছে কিনা এবং কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিষয়গুলো কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, সভায় উপস্থিতির হার, সদস্যদের অংশগ্রহণের শ্রেণী বিভাগ, সভা পরিচালনাকারীর আচার-আচরণ ও ব্যবহার এবং সবশেষে সভাগুলো অংশগ্রহণমূলক না বক্তৃতাধর্মী তা এ সমীক্ষায় খতিয়ে দেখা হয়েছে। মতলব এলাকায় ১৪২টি গ্রাম সংগঠনের মধ্যে দশটি গ্রাম সংগঠনে এ সমীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে পাঁচটি গ্রাম সংগঠন নির্বাচন করা হয় বিষয়ভিত্তিক সভা এবং অপর পাঁচটি নির্বাচন করা হয় স্বাস্থ্য ফোরাম বিষয়ে সমীক্ষার জন্য। এ গ্রাম সংগঠনগুলোর ছ'মাসের (১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের আগের ছয় মাস) সভা সম্পর্কে তথ্য লাভের জন্য গ্রুপ আলোচনা এবং আরডিপি কর্মীদের সংগে অনানুষ্ঠানিক মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া সভার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার জন্য সরাসরি এ সকল সভায় অংশগ্রহণও করা হয়।

গ্রাম সভা

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বিষয়ভিত্তিক সভাগুলোকে বলা হচ্ছে "গ্রাম সভা"। গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে থেকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। অনেক সময় কর্মসূচি সংগঠক আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করেন। যেমন, ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে সকল গ্রাম সংগঠনের আলোচনার জন্য 'মানবাধিকার' বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছিল। সাধারণত: কর্মসূচি সহকারীরা তাদের নিজ নিজ গ্রাম সংগঠনে সভার সময়সূচি নির্ধারণ করে থাকেন এবং তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সভার আগের দিনটিতে 'গ্রাম সভার' সময় নির্ধারণ করেন। এতে তারা পরের দিনে ঋণের কিস্তি ফেরতের ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, ৯টি মাসিক সভার ৭টিতে (বিগত ছয় মাসের নমুনা থেকে) সঞ্চয় এবং ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে যা সাপ্তাহিক সভাগুলোতেই হতে

[5] "Monthly meetings of RDP: documenting the situation in ten villag organizations in Matlab" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন খালিদ হাসান।

পারত। কিছু সভায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যা 'স্বাস্থ্য ফোরামে' আলোচিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল।

বিগত ছ'মাসে কোন গ্রাম সংগঠনেই বিষয়ভিত্তিক মাসিক সভাগুলো নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। পাঁচটি গ্রাম সংগঠনে নির্ধারিত ১৫টি সভার মধ্যে মাত্র ৫টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে মতলব এলাকায় নির্ধারিত ১৪২টি 'গ্রাম সভার' মধ্যে মাত্র ৮৫টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচটি নির্বাচিত নমুনা সভার মধ্যে ৩টি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে শতকরা ৩১ ভাগ সদস্য স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্য ছাড়াই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদিও নতুন নিয়ম অনুযায়ী শতকরা ৯০ ভাগ সদস্য এবং স্বামীদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিত থাকার কথা।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্মসূচি সহকারীরাই সভা পরিচালনা করেন এবং এগুলো ছিলো বক্তৃতাধর্মী। সবচেয়ে বড় কথা সদস্যরা এটা ভাবতে পারেননি যে এটা তাদেরই সভা। যদিও কর্মসূচি সহকারীরা সভায় বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেন যে "এটা আপনাদের সভা, আপনারাই আমাকে বলুন আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করতে চান, আমি একজন শ্রোতামাত্র"। গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের আলোচনার ভিত্তিতে সভা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্মসূচি সহকারী নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের তা পড়ে শোনাতে বলেন। মতলব আরডিপিতে সকল কর্মসূচি সহকারীই ছিলেন পুরুষ এবং তাদেরকে সভা পরিচলনায় তেমন উৎসাহী মনে হয়নি। এটা করতে হয় বলেই তারা করেছেন। গ্রাম সভায় পুরুষদের অনুপস্থিতির কারণে কর্মসূচি সহকারীরা সদস্যদেরকে তাদের স্বামী অথবা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্যকে সভায় নিয়ে আসার জন্য জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় স্বামীদের না নিয়ে আসলে সদস্যদেরকে ঋণের টাকা না দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। গ্রাম সভায় পুরুষদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণেই কর্মসূচি সহকারীরা এটা করতে বাধ্য হয়েছেন। তবুও প্রতিটি সভায় মাত্র ২/৩ জন পুরুষকে উপস্থিত দেখা যায়।

সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রাম সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই সভায় যোগদান করেছেন। বিষয়ভিত্তিক সভা পরিচালনার জন্য কর্মসূচি সহকারীদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি এমনকি 'গ্রাম সভা' পরিচালনার জন্য তাদের কোন ওরিয়েন্টেশনও হয়নি। দু'টি প্রধান কারণে কর্মসূচি সহকারীদের দিয়ে বিষয়ভিত্তিক সভা পরিচালনা করা সংগত হয়নি। প্রথমতঃ এসব কর্মসূচি সহকারীরা সাপ্তাহিক ঋণের কিস্তি আদায়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন, যেটা তাদের প্রধান কাজ। উপরন্তু কর্মসূচি সহকারীগণ এইসব সভা পরিচালনায় মোটেই উৎসাহী পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কর্মসূচি সহকারীরা (ঋণ) সভা পরিচালানার দায়িত্বে থাকায় সভায় সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত আলোচনা এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে যদিও যৌতুক, বিবাহ বিচ্ছেদ, অধিকার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয় এসব মাসিক সভায় আলোচনা হবার কথা।

স্বাস্থ্য ফোরাম

পলীর জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আরডিপি-র আওতায় ব্র্যাক এর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, টিকা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা এবং সাধারণ চিকিৎসা সেবা পলীর দরিদ্র জনসাধারণের এ পাঁচটি মূল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি আরডিপি'র প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায়

একটি সহজ, স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং সহজে পরিচালিত কর্মসূচি। স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে পরিচিত একজন স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী হচ্ছে এ কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু। গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকেই স্বাস্থ্য সেবিকা নির্বাচন করা হয় বলে তিনি সকলের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন এবং সহজেই সকলের সাথে মিশতে পারেন। মতলব আরডিপি-তে গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সংশিষ্ট 'স্বাস্থ্য সেবিকার' উপস্থিতিতে প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের দ্বি-মাসিক 'স্বাস্থ্য ফোরাম' আয়োজনরে জন্য দু'জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মসূচি সহকারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অসদস্যদেরকেও স্বাস্থ্য ফোরামে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয় কারণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা সমাজের সকলের জন্যই দেয়া হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যার নির্ধারিত ৫টি বিষয়ের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য ফোরামে আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বিষয় দু'মাসের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং একের অধিক বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা করা যায়।

সমীক্ষায় দেখা যায়, বিষয়ভিত্তিক সভা বা গ্রাম সভার মতো 'স্বাস্থ্য ফোরাম' ও যথাযথভাবে আয়োজন করা হয়নি। উলেখিত ছয় মাসে ৫টি গ্রাম সংগঠনের জন্য নির্ধারিত ১৫টি সভার মধ্যে মাত্র ৫টি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বেশিরভাগ সভায় লেট্রিন এবং টিউবওয়েল নিয়েই আলোচনা হয়েছে। একটি মাত্র সভায় শাক-সব্জি চাষ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০/২৫ জন মহিলার উপস্থিতিতেই কর্মসূচি সহকারীরা আলোচনা শুরু করেন। 'মহিলা স্বাস্থ্য কর্মসূচি সহকারীরা' সহজেই গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পারতেন। তবে, তারা মাঝে মাঝে সভায় দেরীতে আসার জন্য অথবা আগের সভাগুলোতে আলোচিত বিষয় স্মরণ করতে না পারলে সদস্যদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন। কিছু কিছু মহিলার কাছে স্বাস্থ্য ফোরামে আলোচিত বিষয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। তাদের বিভিন্ন মন্তব্যের একটি হচ্ছে 'আপনারা বলছেন তেল দিয়ে সবুজ শাক-সব্জি রান্না করে খেতে এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে। কিন্তু আমাদের তেল এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ কেনার সংগতি নেই। আমাদের যদি এগুলো কেনার সংগতিই না থাকে তাহলে এ বিষয়ে আপনারা সভায় কি আলোচনা করেছেন তা আমাদের মনে রেখে কি লাভ?"

স্বাস্থ্য ফোরামে আসতেও মহিলাদের বেশি উৎসাহী মনে হয়নি। যে ৫টি স্বাস্থ্য ফোরাম সমীক্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয় সেখানে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৪৩%। কারণ দিনের বেলায় মহিলাদের যেহেতু ব্যস্ত থাকতে হয় সে কারণে তারা সভায় বেশি সময় থাকতে চাইতেন না। কোন কোন মিটিংয়ে দেখা গেছে, স্বাস্থ্যসেবিকা মহিলাদের ফোরামে ডেকে আনছেন। অনেকে হাতের কাজ নিয়েও সভায় উপস্থিত হয়েছেন। এ জন্য সভায় মহিলাদের আসা-যাওয়া অব্যাহত থেকেছে। যা অনেক ক্ষেত্রে কর্মসূচি সহকারীদের রাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রাম সভার মত স্বাস্থ্য ফোরামেও গ্রাম সংগঠনের অল্প কিছু নেত্রী স্থানীয় মহিলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যেমন, স্বাস্থ্যসেবিকা। এসব সভায় অসদস্য উপস্থিত ছিল না।

মতলব আরডিপি-র কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে 'স্বাস্থ্য ফোরামের' নির্ধারিত ৩৮টি সভার মধ্যে ২৩টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপস্থিতির হার ছিল ৪৬%। এ সময়ে স্বাস্থ্য ফোরামের সকল সভা না হওয়ার কারণ ছিল স্বাস্থ্য কর্মসূচি সহকারীদের প্রশিক্ষণে দু'দিনের ব্যস্ততা। এছাড়া তারা টিকাদান কর্মসূচিতেও ব্যস্ত ছিলেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে আঞ্চলিক অফিস থেকে বিক্রিত লেট্রিনের সংখ্যা এবং মাঠ পর্যায়ে এসব লেট্রিন স্থাপনের সংখ্যায় যে গড়মিল দেখা যায় সে বিষয়টি পরখ করে দেখার কাজে কর্মসূচি সংগঠক এবং কর্মসূচি সহকারীরা ব্যস্ত ছিলেন।

বিষয়ভিত্তিক সভা বা গ্রাম সভার জন্য সুপারিশ

- বিষয়ভিত্তিক সবা বা গ্রাম সভার জন্য আরডিপি-র ভিন্ন কর্মসূচি সহকারী বিশেষ করে মহিলা কর্মসূচি সহকারী নিযুক্ত করতে হবে। তাদেরকে অংশগ্রহণমূলক সভা পরিচালনা এবং সদস্যরাই যাতে আলোচনা শুরু করতে পারেন সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

- সভাগুলো এমনভাবে আয়োজন করতে হবে যাতে কর্মসূচি সহকারী অনুপস্থিত থাকলেও সদস্যরা আলোচ্য বিষয় নিয়ে নিজেরাই আলোচনা করতে পারেন। কর্মসূচি সহকারীদের জন্য অবশ্য রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

- সংগঠনের উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। যা ছাড়া দলের মধ্যে একাত্মতা আশা করা যায় না। একই সংগে বিষয় নির্বাচনে সদস্যদের সুযোগ থাকতে হবে।

- বাস্তবায়ন কমিটির কার্যক্রমের কার্যকর ফলো-আপ করতে হবে।

- সভার মান এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভার সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে। প্রতি মাসের পরিবর্তে দ্বি-মাসিক ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য ফোরামের জন্য সুপারিশ

- গ্রাম সংগঠনগুলোর অকার ছোট করার নীতিগত সিদ্ধান্ত যদিও গ্রহণ করা হয়েছে তবুও তা তৃণমূল পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। সভাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে গ্রাম সংগঠনের আকার ছোট করতে হবে।

- কর্মসূচি সহকারী এবং কর্মসূচি সংগঠকরা সভায় উপস্থিতির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের সংগে সভা অনুষ্ঠানের সুবিধাজনক সময় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

- স্বাস্থ্য ফোরামকে কিভাবে অংশগ্রহণমূলক করা যায় সে বিষয়ে কর্মসূচি সহকারীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মূল আলোচ্য বিষয় ঠিক করার জন্য গ্রাম সংগঠনের সদস্যদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। এগুলো আলোচিত হওয়ার পর কর্মসূচি সহকারীরা তাদের নিজেদের বিষয় (যদি থাকে) উথাপন করতে পারেন।

পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল ঃ ব্র্যাক কর্মসূচিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়[6]

রিতা সেন, সাবাহ্ তারান্নুম ও পারুল সলতা বিশ্বাস

১৯৯৬ এর জানুয়ারীতে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল (পিআরএ) অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষার উপ একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা আরডিপির রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) ও সেক্টর স্পেশালিস্টদের (এসএস) জন্য। এই প্রতিবেদনে ঐ কর্মশালার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ও সুপারিশগুলো স্থান পেয়েছে। কর্মশালায় ২৪ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন রিজিওনাল ম্যানেজার, ৬ জন সেক্টর স্পেশালিস্ট ও গবেষণা বিভাগের তিন জন গবেষক। আরডিপির একজন প্রোগামে ম্যানেজার কর্মশালায় বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল আরডিপির আরএমদেরকে পিআরএ'র কৌশল সম্পর্কে পরিচিত করানো এবং আরডিপি-তে এর প্রায়োগিক দিকগুলো দেখা। অংশগ্রহণকারীগণ কর্মশালা থেকে পিআরএ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, তাদের পিআরএ প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, পিআরএ ব্যবহারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র সনাক্ত করতে পারবে, এবং এরিয়া ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ও প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্টদের কর্মপরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য পিআরএ ব্যবহার করবে, এই আশা নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।

আট দিনব্যাপী এই কর্মশালার দুই দিন রাখা হয়েছিল মাঠ পর্যায়ে প্র্যাক্‌টিসের জন্য। অংশগ্রহণকারীগণ ফিল্ডের অভিজ্ঞতা ও তাদের সুপারিশ সমাপণী সেশনে পেশ করেন। মূলতঃ পিআরএ ধারণা ও এর পটভূমি সম্পর্কে তাদেরকে পরিচিত করানো হয়। যেমনঃ পিআরএ নীতি, পটভূমি, পিআরএ ব্যবহারের যৌক্তিকতা, পিআরএ-এর বিভিন্ন কৌশল ও আরডিপি কর্মকাণ্ডে পিআরএ-র প্রয়োগযোগ্যতা।

পিল্ডের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করে চারটি গ্রামে পাঠানো হয় যেখানে আরডিপির ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি চলছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কতিপয় পিআরএ কৌশল এর প্রয়োগিক দিক দেখা হয় যেমন, এলাকার মানচিত্রকরণ, সামাজিক মানচিত্রকরণ, মত বিনিময়, ক্যালেণ্ডার, ম্যাটরিক্স পরিবর্তন ও ধারা, উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি, জীবনধারা বিশ্লেষণ, ভেন ডায়াগ্রাম ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা।

প্রথম গ্রুপ গাজীপুরের দিঘিরচালা গ্রামে কাজ করেছে। সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করার জন্য আরডিপি এ এলাকায় মাত্র কাজ শুরু করেছে। দেখা যায় পিআরএ-এর বিভিন্ন কৌশল তারা এখানে ব্যবহার করছে।

---

[6] "PRA: How it can be used in BRAC programmes" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জানুয়ারী ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ।

দ্বিতীয় গ্রুপ গাজীপুরের পটকাবোতারটাক গ্রামে কাজ করেছে। এখানে সবেমাত্র গ্রাম সংগঠন গঠিত হয়েছে কিন্তু কোন কর্মসূচি চালু করা হয়নি। এখানে এ গ্রুপ মহিলাদের জন্য সম্ভাব্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ সনাক্ত করার চেষ্টা করেছে।

তৃতীয় গ্রুপ ময়মনসিংহ জেলার রঘুনাথপুর গ্রামে কাজ করেছে। এখানে তারা মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাব দেখার জন্য পিআরএ-র বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছে। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড এখানে শুরু হয় ১৯৯৩ সালে।

চতুর্থ গ্রুপ মহিলা সদস্যদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরির কাজ করেছে। অবশ্য মহিলারা আয়মূলক কাজ হিসেবে সবজি চাষকে বেছে নিয়েছে। এ কাজ শুরু হয়েছে ময়মনসিংহের মধুপুরে। ব্র্যাক এখানে কাজ শুরু করেছে ১৯৯২ সালে।

মাঠ থেকে ফিরে এসে চার গ্রুপ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে। পিআরএ'র যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করেছে এবং প্রয়োগ করতে গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা নিয়ে প্রতিটি গ্রুপ একটি করে প্রতিবেদন তৈরি করেছিল। নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে পিআরএ কৌশল প্রয়োগের জন্য কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন।

কর্মশালার সমাপণী দিনে প্রত্যেক গ্রুপ তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে প্রতিবেদন তৈর করেছিল তা পেশ করে। ঐ দিন ব্র্যাকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদন পেশ করার পর আলোচনা হয়। বিভিন্ন কর্মসূচিতে পিআরএ প্রয়োগের জন্য সুপারিশ ও কৌশলগত দিক নিয়েও আলোচনা হয়। এই সমাপণী দিনে কতিপয় প্রশ্ন তোলা হয় এবং কিছু বিষয় আলোচনা হয়। যেমন, রিজিওনাল ম্যানেজারগণ ভবিষ্যতে তাদের কাজে পিআরএ কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা, ব্র্যাক কর্মসূচিতে পিআরএ-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যাবে কিনা, রিজিওনাল ম্যানেজারদের কোন রিফ্রেশার ট্রেনিং প্রয়োজন কিনা, পিও এবং পিএ-দের প্রশিক্ষণের জন্য পিআরএ-এর উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সহায়তা দরকার কিনা, গবেষণা বিভাগ রিজিওনাল ম্যানেজারদে পিআরএ সংক্রান্ত কোন সহায়তা করতে পারে কিনা, রিজিওনাল ম্যানেজারগণ মাঠকর্মীদের সাথে পিআরএ কৌশল নিয়ে অলাপ-আলোচনা করতে পারেন কিনা, ইত্যাদি।

রিজিওনাল ম্যানেজারগণ বলেছেন যে, পিআরএ শুধুমাত্র লক্ষ্যগোষ্ঠী ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প চিহ্নিতকরণে প্রয়োগ করা যায়। গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপক বলেন, পিআরএ ব্যবহার বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং ব্র্যাকেও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন যে, অংশগ্রহণকারীগণ মাসিক সভায় পিআরএ কৌশল ব্যবহার করতে পারেন এবং গবেষণা বিভাগ ছয় মাস পরে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে দেখতে পারে যে পিআরএ ব্যবহার কতটুকু হয়েছে।

ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে পিআরএ-র ব্যবহারে চাহিদা তৈরি হয়েছে। এনএফপিই ইতোমধ্যে তাদের ফিল্ড ম্যানেজারদের পিআরএ-এর উপর প্রশিক্ষণ দানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা[৭]

আব্দুলাহেল হাদী, সমীর রঞ্জন নাথ ও এ এম আর চৌধুরী

বিগত তিন দশক হতে দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেয়া হলেও দারিদ্রের বোঝা নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক জনগণের উপর এখনও চেপে আছে। আজ যারা স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত, দরিদ্র, অশিক্ষিত ও বেকার তারাই এর শিকার। এ দেশের দারিদ্র পরিস্থিতি আজও অপরিবর্তিত ও স্থবির হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ জনই দরিদ্র। গত দু'দশকে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বহু স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্র্যাকও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের জীবন যাপনের মান উন্নয়ন ঘটানো। ব্র্যাকের ঋণ সুবিধাভোগীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও জীবন যাপনের মান উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়।

ব্র্যাকের 'ওয়াচ' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জেলা থেকে ৮৫টি খানা বাছাই করা হয় এ সমীক্ষার জন্য। মোট ৮১৪ জন খানা প্রধানের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। দেখা গেছে, এক-তৃতীয়াংশ খানা হয় ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির সাথে জড়িত আছে এবং দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ উন্নয়ন সংস্থার কোন কর্মসূচির সাথে জড়িত নয়। যে সকল খানা কোন সংস্থার কোন কর্মসূচির সাথে জড়িত নয় তাদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, একটি হল টার্গেট গ্রুপ, অন্যটি টার্গেট বহির্ভূত। গবেষণায় দেখা গেছে, ১০% খানা শুধুমাত্র ব্র্যাক থেকে ঋণ পেয়েছে, ২২% খানা অন্যান্য সংস্থা থেকে পেয়েছে, ঋণ গ্রহণের যোগ্য ২৬% খানা কোন সহায়তা পায়নি এবং ৪২% খানার অবস্থা ভাল বিধায় তারা ঋণ কর্মসূচিতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং ঋণও পায়নি।

কোন উন্নয়ন সংস্থার যে কোন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কোন খানা তথা ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, যে সকল খানা কোন ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে তারা খাদ্য বাবদ বেশি অর্থ খরচ করতে পারছে। কিন্তু তাদর চেয়ে দরিদ্র শ্রেণী তা পারেনা । মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে। দেখা গেছে, শতকরা ২০ ভাগ খানা প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে খাদ্য বাবদ অনেক কম অর্থ খরচ করে এবং ৯.৭% খানা অত্যন্ত দরিদ্র। যে সকল দরিদ্র খানা ঋণ কর্মসূচির সাথে জড়িত নয় তাদের খাদ্য বাবদ খরচ অত্যন্ত কম এবং খানায় তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র খুব কমই আছে।

[7] "Improving living condition of the rural poor: role of poverty-focused development programme" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (অক্টোবর ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ।

দেখা যায়, ২৩.৬% ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় না। স্কুলে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তাদের অর্ধেকই পড়ালেখার খরচ বহন করতে পারেনা বলে জানিয়েছে, ২২.৫% বলেছে (মেয়ে) তারা তাদের মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে, এবং ১৫.৬% জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত বিধায় পড়ালেখা করতে পারে না। টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষীভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিতদের হার বেশি এবং লক্ষ্য বহির্ভূতদের মধ্যে এ হার অনেক কম। তবে ব্র্যাক সদস্য খানার মাত্র এক-চতুর্থাংশ ছেলে-মেয়ে শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে। ব্র্যাক সদস্য খানায় এত কম সংখ্যক ছেলে-মেয়ে শিক্ষা বঞ্চিত থাকার কারণ হচ্ছে ব্র্যাক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ব্র্যাকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস সফল হয়েছে। প্রায় অর্ধেক খানাই প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে বলে জানিয়েছে, এরমধ্যে ৩২% প্যারামেডিক এবং ১৮% ট্রাডিশনাল চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন।

দেখা গেছে, দরিদ্রদের ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। দরিদ্র খানার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা সর্বাধিক। যারা ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেনি তাদের চেয়ে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের আর্থিক অবস্থার প্রায় দ্বিগুণ উন্নয়ন হয়েছে। এমনও দেখা গেছে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত অন্যান্য এনজিওদের চেয়েও ব্র্যাক বেশি ভূমিকা রেখেছে।

মোট কথা হচ্ছে, দরিদ্রদের ঋণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শ্রমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কঠিন কোন বিষয় নয়।

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে জটিলতাঃ একটি সমীক্ষা[৮]

গজেন্দ্র কে ভার্মা, টম ক্রিস্টি, ফিরোজা বেগম, শাহিন আক্তার ও পলিন ম্যাকলে

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯১ সন থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। ঐ ঘোষণাকে একই বৎসরে একটি আইনে পরিণত করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি থেকে এক মাইলের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করতে হবে – আইনে এই শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। সরকারের একার পক্ষে এই বিরাট দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারী সংস্থাও (এনজিও) এ কাজে এগিয়ে আসতে পারে বলে মনে করা হয়।

ব্র্যাকও এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে ৩ বৎসর মেয়াদী উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়। ব্র্যাক দেশের গ্রামীণ এলাকায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলগুলো স্থাপন করতে থাকে। স্কুলের আশেপাশের এক মাইলের মধ্যে বসবাসকারী দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের নির্বাচন করা হয়। লক্ষ্য রাখা হয় ভর্তির সময় যাতে ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৭০ জন মেয়ে হয়। স্কুলে ভর্তির পর ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজী, অংক ও সমাজ বই ও পড়ালেখার অন্যান্য সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। আনন্দঘন পরিবেশে ছেলে-মেয়েরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ দেয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। এ রকম স্কুল ঘরের মেঝে মাদুর পেতে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা করে। একজন শিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীরা তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত পড়াশুনা সমাপ্ত করে। আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হয়ে আলো পড়ালেখা করার জন্য তাদেরকে সব সময়ই উৎসাহিত করা হয়।

আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলগুলো প্রায় সবই সরকারি প্রতিষ্ঠান। সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে ব্র্যাক স্কুলেগুলো হতে স্কুলগুলো অনেকটা আলাদা। যেমন প্রতি ক্লাসে ব্র্যাকের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী অনেক বেশি, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুই তিন মাইল হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। বেঞ্চিতে বসে পড়ালেখার সুযোগ পেলেও কেবল পাঠ্যসূচির অন্তর্গত পুস্তক পাঠ করতে হয়, নাচ, গান কিংবা কবিতা আবৃত্তি করার কোন সুযোগ নেই। বছর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করে পরবর্তী ক্লাসে উঠতে হয় ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হতে হলে ব্র্যাক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভর্তি পরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক) দিতে হয়। আনুষ্ঠানিক স্কুলের নতুন পরিবেশে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ ব্র্যাক স্কুলে তারা যে পরিবেশে পড়ালেখা করেছে আনুষ্ঠানিক স্কুলে সে পরিবেশ নাই। ফলে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক স্কুল ছেড়ে চলে যায়, কেউ কেউ পালিয়ে বেড়ায় এবং কেউ কেউ স্কুল ফাঁকি দেয়। ব্রাক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের এই পরিস্থিতির কারণ উদ্ঘাটনের জন্য ব্র্যাক এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়।

---

[8] "The mainstreaming of BRAC'NFPE students" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এম এ কুদ্দুস।

সমীক্ষার জন্য জামালপুর, ফরিদপুর এবং নরসিংদী অঞ্চলের স্কুলগুলো বাছাই করা হয়। সেই সরকারি স্কুলগুলোর ১৪ জন প্রধান শিক্ষক, ২৯ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ব্র্যাক স্কুলের ৯ জন শিক্ষককে নেয়া হয়। এনএফপিই স্কুলের ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী, আনুষ্ঠানিক স্কুল ছেড়ে যাওয়া ব্র্যাক স্কুলের প্রাক্তন ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং সে স্কুলে অধ্যয়নরত ব্র্যাক স্কুলের প্রাক্তন ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রীকেও নির্বাচন করা হয়। এজন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা ২টি কমিটি, ১ জন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, ব্র্যাকের ৫ জন কর্মসূচি সংগঠক ও কর্মসূচি সহকারী এবং সে টিমের ইনচার্জকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফলে জানা যায়, আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলোর বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্তমানে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করতে ইচ্ছুক নন। কারণ, ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুলের সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বয়সে বড় বলে তাদের সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না; পাঠ্য পুস্তক পড়তে অসুবিধাবোধ করে, স্কুলে আসে অনিয়মিতভাবে। তবে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে তাদের এরূপ মন্তব্য সঠিক নাও হতে পারে বলে সমীক্ষকদল মনে করেন।

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন সরকারি স্কুল ছেড়ে দেয় তার কারণ প্রসঙ্গে তিনজন শিক্ষকের ধারণা, এক ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ নতুন অন্য এক পদ্ধতিতে প্রবেশের জন্যই এমনটি ঘটেছে। সমীক্ষকগণ তাদের সাথে এ ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, তবে তারা মনে করেন আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষকগণ তাদের সাথে একটু আন্তরিক হলে হয়ত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। অনেক শিক্ষক মত প্রকাশ করেছেন যে, ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংক ও ইংরেজীতে কাঁচা থাকে। ফলে তারা অস্বস্তিতে ভোগে এবং স্কুল পরিত্যাগ করে। তবে এ অভিযোগ সত্য কিনা তা বলা কঠিন। দেখা যায়, ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষকগণ তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তির সময় সাহায্য করেছেন। ব্র্যাক স্কুলের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক বলেছেন যে, তাদের নিজস্ব স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রীদের ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান সমীক্ষাদলকে অবহিত করেন যে, ব্র্যাক স্কুলের আশপাশের বসবাসকারী লোকজন চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করে, তাদের সন্তানগণ প্রায় অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটায়, স্কুলে পাঠাগারের সুবিধে নেই, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই এবং ছেলে-মেয়েদের বসার স্থানেরও অভাব রয়েছে। তাই এসব কারণেই ব্র্যাক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হবার সুযোগ দেয়া হয়নি। তারা আরো বলেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের উভয় শ্রেণীর স্কুল ছেড়ে যাওযার কারণ চরম দারিদ্র, পিতামাতার অশিক্ষা, শিশু শ্রম ও বাল্য বিবাহ।

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুইজন জানায়, তারা সে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দ অনুভব করে। তাদের কাছে শিক্ষক ও স্কুলের পরিবেশ খুব পছন্দনীয়। তারা বলে কদাচিৎ দুই একজন ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ছেড়ে চলে গেছে। কারণ তাদের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট, টাকা পয়সার অভাব, এবং পড়াশুনায় অনীহা। এই ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের রেখাপড়া শেষে আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে খুবই ইচ্ছুক, কিন্তু নতুন স্কুলে বড়দের নিকট হতে দুর্ব্যবহার, অনেক পুস্তক পড়াশুনা করা ও শিক্ষকদের পিটুনি খাওয়ার সম্ভাবনার কথা তাদেরকে ভীত করে তুলতো। আনুষ্ঠানিক স্কুলে অধ্যয়নরত ব্র্যাকের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা জানায় ব্র্যাক সুলের পড়াশুনা করার

পদ্ধতি তাদের কাছে ভাল লাগতো, আনুষ্ঠানিক স্কুলে তারা গান গাওয়া ও নাচের সুযোগ পায় না, তবে এই স্কুলে বেঞ্চিতে বসে পড়ালেখার সুযোগ তাদের অনেকের কাছেই পছন্দনীয়। ছাত্র-ছাত্রীরা জানায় অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের চেয়ে তারা গরীব পরিবারের সন্তান, সেজন্য তাদের অভিভাবকরা তাদের স্কুলে পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে না।

ব্র্যাক স্কুলে তিন বৎসর পড়াশুনার পর ছেলে-মেয়েদের আনুষ্ঠনিক স্কুলের পুস্তক ও অন্যন্যা সরঞ্জাম ক্রয় করার ক্ষমতা অভিভাবকদের নেই। এ ছাড়া তাদের মধ্যে কোন কোন মেয়ে বাড়িতে কাজ করে। ব্র্যাক স্কুলের ছাত্ররা জানায় তাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব এখনও আনুষ্ঠানিক স্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তবে দেখা গেছে, ব্র্যাক স্কুলের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভাল করে।

ব্র্যাক স্কুলে একটি শ্রেণীতে ৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে। সেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক স্কুলের একটি শ্রেণীতে ১০০ বা তার অধিক ছাত্র-ছাত্রীও থাকতে পারে। এ অবস্থায় ব্র্যাক স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের দৃষ্টি লাভে সমর্থ হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিক স্কুলে সেটি সম্ভব হয় না। ব্র্যাক স্কুল রয়েছে একজন শিক্ষক আর আনুষ্ঠানিক স্কুলে শিক্ষা দেয় একাধিক শিক্ষক। ব্র্যাক স্কুলের ক্লাসের আকার ছোট বলে ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তির সাথে সাথে তাদের নির্দিষ্ট পড়াশুনা আনন্দের সাথে করতে পারে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক স্কুলে পাঠ্যসূচির বাইরে এমন কিছু দেখা যায় না।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি ও এনজিওদের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তা কোন পর্যায়েই দেখা যায়নি। সরকারি স্কুলের প্রধান ও অন্যান্য সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে একটি অনুচ্চারিত কথা শোনা গেছে যে, ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষকরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নমানের শিক্ষা দেন। অবশ্য এটার পক্ষে কোন তথ্য তারা উপস্থাপন করেননি।

একই শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় একটি স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালিযে যেতে নতুন শিক্ষার্থীরা অসুবিধা ভোগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি আনুষ্ঠানিক স্কুলের নতুন শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশে নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে নতুন স্কুলের শিক্ষকগণ যদি তাদেরকে শিক্ষাদানের সময় বিশেষভাবে সাহায্য না করেন তাহলে তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। এমন সহানভূতি ব্র্যাক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা পায়নি। যদিও অনেক স্কুল শিক্ষকই বলেছেন তারা সব ছাত্র-ছাত্রীদের সমান চোখে দেখেন।

ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভের উপর তাদের পিতামাতার শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেক্ষেত্রে ব্র্যাক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন সুবিধা পায়নি। কারণ, তাদের পিতামাতা প্রায় সবাই অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত দরিদ্র।

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার আর একটি বড় কারণ হলো তাদের পারিবারিক দরিদ্রতা। এ সমস্ত পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পরে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যাতে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল ও সরকারি স্কুলের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে সে উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন, ব্র্যাক ও শিক্ষা অধিদপ্তরকে ব্র্যাক ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তির সাথে জড়িত অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও শিক্ষাদর্শন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। ব্র্যাকের নিজস্ব উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, বর্তমান তিন বৎসর মেয়াদী কোর্সের পরিবর্তে পাঁচ বৎসর মেয়াদী কোর্স চালু করতে হবে।

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপণকারী ছেলে-মেয়েদের অর্জিত মৌলিক দক্ষতার মূল্যায়ন[৯]

সমীর আর নাথ ও মোশ্‌তাক আর চৌধুরী

১৯৯০ সালে থাইল্যাণ্ডের জোমতিয়েন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেখানে উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটা নতুন লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দুই হাজার সাল নাগাদ এই সব দেশের স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকর ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দেশের অন্তত:পক্ষে ৮০% স্কুলে যাবার মত উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারপর ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ করা হয়। মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী অবধি শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা শিশু ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ব্র্যাক ১৯৮৫ সাল থেকে শিশুদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালে ব্রাকের স্কুল থেকে যে সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপণ করেছেন, তারা কতটুকু মৌলিক শিক্ষা লাভ করেছে সেই বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে ২২টি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচির সূচনা করে। ব্র্যাক তিন প্রকার শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়। যেমন আট থেকে দশ বছরের শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, এগারো থেকে চৌদ্দ বছরের কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষা। এই দুইটির শিক্ষাকাল তিন বছর মেয়াদি। আর একটি হচ্ছে শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম। এর মাধ্যমে অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে। ব্র্যাক এতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে। যেমন: লিখতে ও পড়তে পারা, সাধারণ অংক, স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ, বহির্বিশ্ব এবং মৌলিক বিজ্ঞান চেতনা। তদুপরি এই সকল স্কুলে থেকে যারা শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে।

১৯৯৫ সালে মোট ৩,৯৯৩টি বিদ্যালয়ে কোর্স সমাপ্ত হয়েছে। সেখান থেকে সর্বমোট ১১৯,৭৯০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপন করেছে। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা হয়েছে যে, যারা শিক্ষা সমাপন করেছে তারা

---

[9] "Assessment of basic competencies of the graduates of BRAC's education programme" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (এপ্রিল ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন ফজলে রাব্বি।

কতটুকু মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেছে, ছেলে ও মেয়েদের দক্ষতার তুলনামূলক চিত্র কী এবং দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন আর্থ-সামাজিক পার্থক্য রয়েছে কিনা।

১৯৯৫ সালে যে ১২৬টি টিমে স্কুল সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো থেকে ৩০টি স্কুল বাছাই করা হয়। তারপর ঐ ৩০টি স্কুলের নিকটবর্তী আরও ৩০টি স্কুল নেওয়া হয়। এই দুই স্কুলের যে সব ছেলে-মেয়ে শিক্ষা সমাপন করেছে তাদের মধ্য থেকে ৭ জন ছেলে ও ৭ জন মেয়ে বাছাই করা হয়। অপরদিকে শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির অধীন সমাপ্ত হওয়া ১২৯টি স্কুলের মধ্যে ৩০টি নির্বাচন করা হয়। এদের নিকটবর্তী আরও ৩০টি স্কুল নেয়া হয়। প্রতি দুটি স্কুলের শিক্ষা সমাপনকারীদের মধ্য থেকে ৭ জন ছেলে ও ৭ জন মেয়ে নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলগুলো ছিল আরডিপি এলাকায় আর শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির অধীন স্কুলগুলো ছিল সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্ম এলাকায়। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও কিশোর-কিশোরী মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম ও ব্র্যাকের শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প থেকে ৬০৭ জন ছেলে ও ৬৫২ জন মেয়ে মোট ১,২৫৯ জনকে বাছাই করা হয়।

মৌলিক শিক্ষা বলতে সে ধরনের শিক্ষাকে বোঝায় যা একজনকে লিখতে, পড়তে এবং সাধারণ হিসাব করতে শেখায় এবং তাদের জীবনের মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান প্রদান করে। এ গবেষণায় জীবন দক্ষতা সম্পর্কিত ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৭টির সঠিক উত্তর, পড়তে পারা অনুচ্ছেদের ৪টি প্রশ্নের ৩টির সঠিক উত্তর, চিঠির মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করতে পারা এবং ৪টি মৌলিক অংকের মধ্যে ৩টি সঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের যোগ্যতা হিসাবে ধরা হয়েছে।

এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় যারা শিক্ষিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এরা যে সব পরিবার থেকে এসেছে সেই সব পরিবারের অর্ধেকেরই বাৎসরিক খাদ্য সংকট রয়েছে। ৫৫% অভিভাবক জানিয়েছে তাদের পরিবারে কম করে হলেও একজন বৎসরে ১০০ দিন কায়িক শ্রম দেয়। ৫৭.৫% পরিবারে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের কম।

মৌলিক দক্ষতা

এই সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৫ সালে যে সব ছেলে-মেয়ে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপন করেছে তাদের ৭৩.৮% ভাগ মৌলিক দক্ষতার ৪টি ক্ষেত্রেই সফলতার পরিচয় দিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের দক্ষতা অর্জন গড়ে প্রায় সমান। আরডিপি এলাকার উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও কিশোর-কিশোরীদের মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচিতে মেয়েরা সবচেয়ে ভাল করেছে।

দক্ষতা অর্জনে বয়সের পার্থক্য অনুসারে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন, ১৩-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ১১-১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের থেকে ভাল করেছে। তাছাড়া যেসব ছেলে-মেয়ে আগে থেকেই কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তারাও তুলনামূলকভাবে ভাল করেছে। যেসব ছেলে-মেয়ের বাবা-মা কিছুটা শিক্ষিত অথবা তারা কোন সময় তারা কোন সময় স্কুলে গিয়েছিল তাদের দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি অর্জিত হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে মা যেখানে শিক্ষিত সেখানে বেশি সফলতা অর্জিত হয়েছে। যেসব ছেলে-মেয়ের বাবা-মা কোন সময় স্কুলে গিয়েছিল তাদের দক্ষতা যাদের বাবা-মা স্কুলে যায়নি তাদের থেকে ভাল।

মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ছাত্র-ছাত্রীকে বিবেচনার মধ্যে আনা হয়েছিল। একটি হচ্ছে ব্র্যাক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচি ও ব্র্যাকের সাহায্য প্রাপ্ত বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত শিক্ষা কর্মসূচি। এদের মধ্যে কিশোর-কিশোরীরা সব ক্ষেত্রেই ভাল করেছে। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা কার্যক্রমের এবং ব্র্যাকের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভাল করেছে। অন্যদিকে সকল ক্ষেত্রের ছেলেরা অংকে ভাল করেছে। বয়সের বিবেচনায় দক্ষতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে সেটি পরীক্ষা করলে দেখা যাচ্ছে, কিশোর-কিশোরীরা তুলনামূলকভাবে ছোটদের চাইতে দ্বিগুণেরও বেশি ভাল করেছে।

যেসব পরিবারের বাড়িতে সাংবাৎসরিক খাদ্যাভাব ঘটেনি তাদের ছেলে-মেয়েরা খাদ্যাভাবগ্রস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে অধিক দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। যেসব পরিবারের কোন একজন ব্র্যাকের সদস্য সেই পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যে পরিবারে কোন ব্র্যাক সদস্য নেই সেই পরিবারের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে খারাপ ফল করেছে। ৫০ শতাংশ জমিওয়ালা পরিবারের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে ৫০ শতাংশের কম জমি যাদের সেই পরিবারে ছেলে-মেয়েরা দক্ষতা কম অর্জন করেছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষা অর্জনের জন্য জমির পরিমাণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

দেখা গেছে যে, যারা রেডিও বা টিভি শুনতে বা দেখতে পায় তাদের ফলফল যারা রেডিও টিভি শুনেনা বা দেখেনা তাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল। যারা টিভি দেখ তাদের দক্ষতা অধিকতর ভাল।

ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের যে দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে তার পেছেনে আর্থ-সামাজিক কারণ কতটুকু প্রভাব ফেলে তা দেখা হয়েছে। এই শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা ফুটে উঠেছে। দেখা গেছে যে, বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এমন শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েরা যারা ভর্তি হয়নি তাদের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি দক্ষ; যারা টিভি দেখে তাদের দক্ষতা যারা দেখেনি তাদের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। দক্ষতা অর্জনে টিভির ভূমিকা গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয়।

দশ বছর কিংবা তার চেয়ে কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের তুলনায় ১৫-১৮ বছর বয়সের এবং ১৩-১৪ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েরা যথাক্রমে ১.৪১ ও ১.৫৬ গুণ বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে। অন্যদিকে, ১৩-১৪ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা ঐ একই বয়সের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে দ্বিগুণের বিশে (২.০৬) দক্ষতা দেখিয়েছে।

যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান। সমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় উন্নত মানে র শিক্ষা প্রদান ব্র্যাকের লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সমাপনকারীদের ৭৩.৮% মৌলিক শিক্ষার চারটি শর্তই পূরণ করেছে এবং এক-চতুর্থাংশের অধিক আংশিক মৌলিক দক্ষতা অর্জন করেছে।

জাতীয় পর্যায়ের মানের থেকে ব্র্যাকের এই শিক্ষার্থীদের ফলাফল অনেক উন্নত। এর কারণ সম্ভবত: ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নত গুণগত মান। অবশ্য অদ্যাবধি ব্র্যাকের মান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তবে ২০০০ সাল নাগাদ ৮০% স্কুলে যাবার

উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের জন্য যে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে তার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

প্রকৃতপক্ষে ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা সমান সুযোগ থাকা আবশ্যক। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ধনী ঘরের ছেলে-মেয়েরা গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে ভাল করছে এবং অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা অধিক সংখ্যায় ব্র্যাকের স্কুলে আসছে। বিষয়টি গভীরভাবে তলিয়ে দেখা আবশ্যক।

এই সমীক্ষায় আর একটি জিনিস দেখা যাচ্ছে যে, ব্র্যাক স্কুল থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হচ্ছে কিন্তু তারা দু'বছর পর স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে। এর কারণ উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। উপায় বের করতে হবে যাতে তারা যেন আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সমাপন করতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ও ব্র্যাকের মধ্যে জাতীয় স্বার্থে একটা সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক।

গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার ঃ ব্র্যাকের ভূমিকা[১০]

আব্দুলাহেল হাদী ও সমীর রঞ্জন নাথ

উন্নয়নের জন্য অক্ষরজ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। কর্মসংস্থানের অভাব এবং চরম দারিদ্রের কারণে গ্রামের দরিদ্র মানুষ জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন প্রতিনিয়ত। এ সংগ্রামে টিকে থাকতে তাদেরকে জড়িত হতে হয় বিভিন্ন কর্তকাণ্ডে। ফলে স্কুলে ভর্তি তাদের কাছে একটি দূরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যারা ভর্তি হয় তারা আবার কিছুদিন পরে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। কাজেই সাক্ষরতার হার বা স্কুলে ভর্তির হার আশানুরূপ বাড়েনি কিংবা স্কুল ছেড়ে দেবার হারও আশানুরূপ কমেনি। সারাদেশ জুড়ে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে যা শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের ভূমিকা কতটুকু তা দেখার জন্য এ গবেষণাটি করা হয়।

‘ওয়াচ’ নামে ব্র্যাকের একটি নিরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে যা বাংলাদেশের ১০টি জেলার ৭০টি গ্রামে কাজ করছে। দরিদ্র মানুষের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে কী কী পরিবর্তন এসেছে তা দেখার জন্যই এই ‘ওয়াচ’ প্রকল্পের সূচনা হয়। এ সমীক্ষার জন্য ওয়াচ প্রকল্পের আওতাধীন ১২০টি খানা ও ১,১০৪টি শিশুকে বাছাই করা হয়। নমুনা খানার এক-তৃতীয়াংশ ব্র্যাক অথবা অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ এ ধরনের কোন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। মোট নমুনা খানার ১২% শুধু ব্র্যাকের ঋণ পেয়েছে, ২৩% পেয়েছে ব্র্যাক বা অন্যান্য সংস্থা থেকে, ১৯% ঋণ গ্রহণেরযোগ্য হলেও তারা কোন ঋণ পায়নি, এবং ৪৬% ঋণ গ্রহণের অযোগ্য অর্থাৎ তাদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল।

এ সমীক্ষায়, সাত কিংবা সাত বছরের বেশি বয়স্কদের প্রতি ১০০ জনে যত জন চিঠি লিখতে ও পড়তে পারে তাকে সাক্ষর ধরা হয়েছে। এ অনুসারে দেখা গেছে, সমীক্ষা এলাকার ৩৫.১% লোক সাক্ষর। মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি। ১৯৯৫ এর ডিসেম্বরে দেখা গেছে, সমীক্ষা এলাকার ৬-১৫ বছর বয়স্কদের ৭৮% ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হার বেশি। তবে বিগত দেড় দশকে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার হারে অঞ্চল ভেদে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে স্কুলে ভর্তির হার বেশ ভাল, যেমন ৬৪.৮% জয়পুরহাটে এবং ৮৭.২% লালমনিরহাটে।

ঋণ কর্মসূচিতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তুলনামূলকভাবে যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্র্যাক সদস্যদের সাক্ষরতার হার অন্যান্য সংস্থার সদস্যদের চেয়ে বেশি। দেখা গেছে, সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন সংস্থার কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। সবক্ষেত্রেই মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি। স্কুলে ভর্তির হারও তাদের মধ্যে

[10] “Literacy and school enrollment in rural Bangladesh: role of BRAC” শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (মে ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উলাহ্।

বেশি যারা কর্মসূচিতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। তবে ছেলেদের তুলনায় স্কুলে ভর্তির হার মেয়েদের মধ্যেই বেশি, বিশেষতঃ ব্র্যাক কর্মসূচিভূক্ত খানাগুলোতে। উন্নয়ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন খানার ছেলে-মেয়দের চেয়ে উন্নয়ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত এমন খানার কম ছেলে-মেয়েরা স্কুল ছেড়ে চলে যায়। তবে অন্যান্য সংস্থার সদস্য খানার ছেলে-মেয়েদের তুলনায় ব্র্যাক সদস্য খানার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার হার কমে গেছে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের স্কুল ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনাও বেশি দেখা যায় ব্র্যাক সদস্য খানায়।

ছেলে-মেয়েদের একটি বিরাট অংশ বলেছে যে, পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না। অর্থাৎ তাদেরকে ভালভাবে উৎসাহ দেয়া হয়নি, আবার অনেকের কাছে স্কুল আকর্ষণীয় নয় বলে স্কুলে যায় না। উপরন্তু অভিভাবকগণও ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বয়স সম্পর্কে সচেতন নন।

দারিদ্রও সন্তানদের স্কুলে না পাঠানোর একটি অন্যতম কারণ। তবে ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত খানার চেয়ে কর্মসূচি বহির্ভূত খানায় দারিদ্রই স্কুল ছেড়ে দেয়ার অন্যতম কার্যকরী কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শিশু শ্রমও এজন্য দায়ী বলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র ও বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করেছে। দেখা গেছে, মোটামুটি ভাল আর্থিক অবস্থার খানার ছেলে-মেয়েদের ৪০% এ কর্মসূচির ফল ভোগ করছে এবং ১৪% কর্মসূচি বহির্ভূত কিন্তু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণযোগ্য খানার ছেলে-মেয়ে এ কর্মসূচির ফল ভোগ করছে।

কাজেই সার্বিক বিবেচনায় এ কথা বলা যায় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে ব্র্যাক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা ঃ একটি সমীক্ষা[11]

ফিরোজা বেগম ও শাহিন আক্তার

শিক্ষা কর্মসূচির একটি অংশ হিসেবে ব্র্যাকের গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা জানার জন্য এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা কর্মসূচি গণশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্প্রসারিত রূপ। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত সাক্ষরতা, দক্ষতা ও উন্নয়নের জন্যই শিক্ষা প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরক্ষরতা হ্রাস, মৌলিক শিক্ষা প্রদানে অবদান রাখা, সরকারের সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ এবং মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৮৫ সাল থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এর ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তিন বছর মেয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করে। তাদের শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখা এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিচেনায় রেখে ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগার স্থাপন করে।

এ সমীক্ষার প্রয়োজনে যশোর, জামালপুর, সিলেট ও রংপুর এনএফপিই এলাকার তিনটি করে ১২টি পাঠাগার নির্বাচন করা হয়। এসব পাঠাগারের ২৪০ জন ব্যবহারকারী (২১৬ জন পুরুষ এবং ২৪ জন মহিলা) এবং সকল লাইব্রেরীয়ানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, পাঠাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সকল বয়সের পাঠকই ছিল, তবে শতকরা ৫৬ ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগ এস. এস. সি. অথবা এইচ. এস. সি. উত্তীর্ণ, ৩৬ ভাগ ৫ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, আর ২০ ভাগ বি. এ. অথবা আরও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। অতি নগণ্য সংখ্যক পাঠাগার ব্যবহারকারী পাওয়া যায় যার প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়াও করেননি (০৩.০%)। পাঠাগার ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই ছাত্র (৫৭%), তবে শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক, দিনমজুর, গ্রাম চিকিৎসক ও চাকুরিজীবীরাও পাঠাগারে আসেন। দেখা যায়, পাঠাগার ব্যবহাকরকারীদের অধিকাংশই (৭২%) ব্র্যাক কর্মী, ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক অথবা অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে এসব পাঠাগারের কথা জানতে পেরেছেন। পাঠাগারের সুফল সম্পর্কে প্রায় সকল ব্যবহারকারী বই, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন পড়ার সুযোগের কথা বলেছেন। মাত্র তিন ভাগ গান, খেলাধুলা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রমের কথা বলেছেন।

গণকেন্দ্র পাঠাগারের মাধ্যমে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে পাঠাগার ব্যবহারকারীরা হাঁস-মুরগী পালন, কারিগরী শিক্ষা, সেলাই, হস্তশিল্প, সব্জি ও রেশম চাষের কথা বলেছেন। কেউ কেউ কম্পিউটার শিক্ষার কথাও বলেছেন। তারা বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তা আয় বৃদ্ধি, আত্ম-উন্নয়নে, সঞ্চয় বাড়াতে এবং ভালো চাকুরি পেতে সাহায্য করবে।

---

[11] "Exploring the status of Ganakendra Pathagar (Library)" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন খালিদ হাসান।

এ সমীক্ষায় ১২ জন লাইব্রেরীয়ানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, যাদের একজন ছিলেন মহিলা। তারা সকলেই এস. এস. সি. অথবা এইচ. এস. সি. পাশ এবং তাদের মধ্যে ৩ জন অন্য পেশায়ও নিয়োজিত আছেন। সকল লাইব্রেরীয়ানই এসব পাঠাগারে গল্পের বই, ধর্মীয় বই এবং জীবনী গ্রন্থ রাখার কথা বলেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক বই, কবিতার বই এবং গবেষণা সংক্রান্ত বই রাখার কথাও কেউ কেউ বলেছেন।

বেশিরভাগ লাইব্রেরীয়ানই পাঠাগারে বই এবং ক্রীড়া সরঞ্জামের স্বল্পতার কথা বলেছেন এবং সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ না করার সমস্যাও উলেখ করেছেন। এছাড়া একযোগে অনেক পাঠকের লাইব্রেরী ব্যবহারের সময় একজন মাত্র লাইব্রেরীয়ানের পক্ষে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না এবং পাঠাগারে দেয়াল ঘড়ি না থাকার কথাও তারা বলেছেন। গণকেন্দ্র পাঠাগারসমূহের উন্নয়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

গণকেন্দ্র পাঠাগারগুলোকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে জনসাধারণকে এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

এখন নগণ্য সংখ্যাক মহিলা এসব পাঠাগার ব্যবহার করছেন। তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটি আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা সপ্তাহে দু'দিন শুধুমাত্র মহিলাদর জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে পাঠাগারের জন্য আরও নতুন বই, জীবনীগ্রন্থ, পাঠ্য বই, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আয় উপার্জনমূলক প্রশিক্ষণ আয় বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির কাজে লাগে এমন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাঠাগারে একটি করে টিভি সেট দেয়া যেতে পারে। অর্থ স্বল্পতার কারণে কয়েকটি নিকটবর্তী পাঠাগারের জন্য একটি টিভি সেটও দেয়া যেতে পারে।

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পুনর্ব্যবহার ঃ একটি সম্ভাব্যতা যাচাই[১২]

ফিরোজা বেগম, শাহিন আক্তার ও আহসান এইচ কাজী

যারা কখনও স্কুলে যায়নি এবং যারা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে এমন দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য ব্র্যাক ১৯৮৫ সন থেকে একটি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে, যা উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। আট হতে দশ বৎসর বয়সী ছেলেমেয়েরা তিন বৎসর মেয়াদী এই উপ-আনুষ্টানিক শিক্ষা গ্রহণ করে স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ছেলে-মেয়েদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চারটি পাঠ্যপুস্তক দেয়া হয় – (১) শিশু পাঠ, (২) এসো পড়ি (১ম ভাগ), (৩) অংক (১ম ভাগ) এবং সহজ পাঠ। আর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেয়া হয় তিনটি পুস্তক – (১) এসো পড়ি (২য় ভাগ), (২) অংক (২য় ভাগ) এবং (৩) সমাজ পাঠ। প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ শেষে প্রদত্ত পুস্তকগুলো আর ফেরত নেয়া হয় না। কিন্তু স্কুলের শিক্ষকগণ কিছুদিন ধরে এ ব্যাপারটি নিয়ে একরকম চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলেন। ভাবনাটি হলো পুরাতন পুস্তকগুলো ফেরত নিয়ে পরবর্তী বৎসরগুলোতে নতুন প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করলে এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালানার খরচ কমে যেতে পারে। এরূপ চিন্তা-ভাবনার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়।

সে উদ্দেশ্যে ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের তিনটি এলাকা যথা মতলব, জামালপুর ও মানিকগঞ্জ এলাকা থেকে ৪টি করে স্কুল নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি এলাকা থেকে দ্বিতীয় গ্রেডের এবং তৃতীয় গ্রেডের ২টি করে স্কুল নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি স্কুল থেকে সব ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে মোট ৩৯৬ জনকে সমীক্ষার জন্য নেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রথম গ্রেডের ও তৃতীয় গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে দ্বিতীয় গ্রেডের ব্যবহৃত পুস্তক ফেরত নেয়ার কথা চিন্তা করা হয়। একই সাথে নির্বাচিত স্কুলের শিক্ষক ও প্রতিটি স্কুল হতে ৪ জন করে অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গবেষকগণ পুস্তকের বাহ্যিক অবস্থা অবলোকন ও পরীক্ষা করে সেগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: (১) ভাল মানের পুস্তক – এ শ্রেণীর অন্তর্গত পুরস্তকগুলো হলো মজবুত, পরিচ্ছন্ন ও আরো এক বৎসর ব্যবহারের উপযোগী, (২) মোটামুটি ভাল মানের পুস্তক – এ পুস্তকগুলো ময়লাযুক্ত, ছেড়া, অপরিস্কার ও আর মাত্র ৪ মাস ব্যবহারের উপযোগী, (৩) ব্যবহারের অযোগ্য পুস্তক – এ পুস্তকগুলো ময়লাযুক্ত, ছিন্নভিন্ন ও ব্যবহারের অনুপযোগী। শিক্ষার্থীরা যে সমস্য পুস্তক ফেরত দিতে ব্যর্থ হয় সেগুলো হারিয়ে গিয়েছে বলে ধরা হয়।

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, প্রথম গ্রেডের পুস্তকগুলোর মধ্যে 'শিশু পাঠ' শতকরা ৮.০ ভাগ ভাল অবস্থায় এবং শতকরা ১৪.৪ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। 'এসো পড়ি' (১ম ভাগ) পুস্তকটির শতকরা ২ ভাগ ভাল অবস্থায় এবং ১৮.২ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

---

[১২] "A feasibility study on re-using textbooks in NFPE schools" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (মার্চ ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এম এ কুদ্দুস।

'অংক (১ম ভাগ)' শতকরা ৪.৬ ভাগ ভাল অবস্থায় ও ১৪.৩ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় দেখা যায়। 'সহজ পাঠ' এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় এ পুস্তকগুলোর মধ্যে শতকরা ১৫.২ ভাগ ভাল অবস্থায় ও ৯.৪ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। দ্বিতীয় গ্রেডের পুস্তকগুলোর মধ্যে 'এসো পড়ি' শতকরা ৫.৩ ভাগ ভাল অবস্থায় এবং ২০.০ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় দেখা যায়। 'অংক (২য় ভাগ)' শতকরা ২১.০ ভাগ ভাল অবস্তায় এবং ২২.৩ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় আর 'সমাজ পাঠ' প্রায় শতকরা ১৫.৫ ভাগ ভাল অবস্থায় ও ১৯.৩ ভাগ মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

এ সমীক্ষায় বিভিন্ন প্রকার পুস্তকগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয় গ্রেডের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তেমন কোন উলেøখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। তবে উভয় গ্রেডেই কোন কোন পুস্তকের বেলায় মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা যেমন – 'শিশু পাঠ' আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এর উল্টোটি অর্থাৎ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা যেমন – 'সমাজ পাঠ' এ ভাল ফল দেখিয়েছে। পুস্তক হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলার ব্যাপারে উভয় গ্রেডের শতকরা ৩৯.০ ভাগ হতে ৮০.০ ভাগ ছেলে-মেয়েরা পায় একই রকম প্রবণতা দেখিয়েছে।

পুস্তক পুনর্ব্যবহার প্রসঙ্গে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন শিক্ষক ও ৫৪.২ জন অভিভাবক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ছেলেমেয়েদেরকে দেয়া পুস্তক ফেরত নিলে তারা বেশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তদুপরি এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর পড়ালেখার জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত হবে বলে শতকরা ৩৩.২ জন শিক্ষক ও ২৯.২ জন অভিভাবক মতামত দিয়েছেন। অধিকন্তু শতকরা ৪১.১ জন শিক্ষক ও ৪৩.৭ জন অভিভাবকের ধারণা যে, সরবরাহকৃত পুস্তকগুলো ফেরত নিলে নতুন শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে।

উপসংহারে বলা যায়, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিকট হতে ফেরত নেয়া পুস্তকগুলোর মধ্যে কেবল শতকরা ১০.৯ ভাগ ভাল অবস্থায় আছে যেগুলো আর এক বৎসর ব্যবহার করা যেতে পারে। শতকরা ১০.০ ভাগ পুস্তক মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে যেগুলো আর কয়েক মাসের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। শতকরা ১৯.০ ভাগ পুস্তক বেশ খারাপ অবস্থায় আছে যেগুলো ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এটাও জানা গেছে, বেশ কিছু পরিমাণ পুস্তক (৫৩%) হারিয়ে গিয়েছে। যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীরা আগে জানতো না যে, তারেদরকে পুস্তকগুলো ফেরত দিতে হবে, সেহেতু তারা সেগুলো ব্যবহারের সময় তেমন কোন যত্ন নেয়নি। তাদেরকে যদি আগেই বলে দেয়া হতো যে, শিক্ষাবর্ষ শেষে পুস্তকগুলো ফেরত দিতে হবে, তাহলে হয়তো তারা সতর্কতার সাথে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতো। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পুস্তক যত্নে রাখার মতো স্থান পরিবেশ তাদের নেই। সমীক্ষা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তিনটি সুপারিশের কথা বলা হয়েছে।

নতুন পুস্তক দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে চাইলে সেগুলোর যত্ন কিভাবে নিতে হবে সে সম্বন্ধে স্কুলের ছেলে-মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করে পুস্তক ছাপানো হলে সেগুলো স্বল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পুস্তক দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্য থাকলে সেগুলো ভালমানের অর্থাৎ অফসেট কাগজে ছাপাতে হবে। যেহেতু শিক্ষার্থীরা ও তাদের অভিভাবকগণ পুস্তকগুলোর মালিকানা হারাতে চায় না, সেহেতু সেগুলো ফেরত না নেয়াই ভালো।

জাতীয় টিকা দিবসের সংগঠন এবং বাস্তবায়ন ঃ ১৯৯৬ পর্বের একটি মূল্যায়ন[13]

ফজলুল করিম, এ এম আর চৌধুরী, আব্বাস ভুঁইয়া, কে এম এ আজিজ, আহমেদ আলী, মো. নজরুল ইসলাম, শাহ নূর মাহমুদ ও দিনেকা মোল

টিকা শৈশবের ছয়টি মারাত্মক রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে। এসব মারাত্মক রোগের মধ্যে একটি হলো পোলিওমাইলেটিস যা সাধারণভাবে পোলিও নামে পরিচিত। এটা শিশু পংগুত্ব নামেও পরিচিত। এ রোগ শরীরের আক্রান্ত অংশকে পংগু করে দেয়। এ স্থায়ী পংগুত্ব শিশুর বিকাশকে ব্যাহত করে। টিকা দেয়া না হলে প্রতি বছর বাংলাদেশের ৬,৫০০ শিশু পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে পংগু হয়ে যেতে পারে। দেখা যায়, প্রতি ১,০০০ পোলিও ভাইরাস আক্রান্ত শিশুর মধ্যে ১-১০টি শিশু পংগু হয়ে যায় এবং অন্যরা বাহক হিসেবে বেঁচে থাকে যাদের দ্বারা এদের বাইরে অন্য শিশুদের মধ্যে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।

৫ বছর বয়সের নিচের সকল শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক টিকা খাওয়ানো হলে মারাত্মক পোলিও ভাইরাস জীবাণুগুলো মলের সাথে মুক্ত পরিবেশে বেরিয়ে এসে তা মারা যায়, কারণ এগুলো মুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে না।

সারাবিশ্ব থেকে গুটি বসন্ত নির্মূলের পর স্বাস্থ্যনীতি প্রণেতারা বিশ্ব থেকে পোলিওমাইলেটিস নির্মূলের অংগীকার ব্যক্ত করেন। পোলিও রোগ নির্মূলের জন্য বাংলাদেশ ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য "জাতীয় টিকা দিবস" (National Immunization DaY) বা NID-র মতো বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে এবং ইউনিসেফ এতে সক্রিয় সমর্থন দেয়। এ বিশেষ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল থেকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (EPI) অতিরিক্ত হিসাবে প্রতি বছর দু'টি করে মোট ছ'টি জাতীয় টিকা দিবস (NID) পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৯৫ সালের ১৬ই মার্চ এবং ২০শে এপ্রিল জাতীয় টিকা দিবস বা NID-র প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ দু'টি দিনে ১-৫ বছর বয়সের শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলও খাওয়ানো হয়। ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করা । একইভাবে ১৯৯৬-এর ১৬ই এপ্রিল এবং ১৬ই মে বাংলাদেশে জাতীয় টিকা দিবসের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ড পালিত হয়। এ দু'দিনে ৫ বছরেরও কম বয়সের শিশুদের পোলিও প্রতিষেধক টিকা খাওয়ানো হয় (লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল প্রায় দুই কোটি শিশু) । একই সংগে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলও খাওয়ানো হয়।

NID-র উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'হাজার সালের মধ্যে দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করা। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিচালিত এ সমীক্ষায় জাতীয় টিকা দিবসের বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত শিশুদের এর আওতায় আনা গেছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ গবেষণায় জাতীয় টিকা দিবসের ৭টি প্রশ্নের উত্তর

---

[13] "National Immunization Days in Bangladesh: An evaluation of the 1996 rounds" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন খালিদ হাসান।

খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ৭টি প্রশ্নের বিষয়গুলো হল: (১) জাতীয় টিকা দিবসের প্রস্তুতি পর্ব, (২) টিকা দিবসের আগের দিন অভিভাবকদের জ্ঞান যাচাই, (৩) টিকা দিবস সম্পর্কে কেন্দ্রে উপস্থিত অভিভাবকদের মতামত, (৪) জাতীয় টিকা দিবস সম্পর্কে স্বাস্থ্য কর্মীদের জ্ঞান, (৫) টিকাদান সেশন পরিচালনা, (৬) পোলিও ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল-এর কভারেজ, এবং (৭) জাতীয় টিকা দিবসের অর্থায়ন।

ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্ম এলাকায় ব্র্যাক কর্মী এবং গবেষকদের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৬টি পৌরসভার ও ৫৬টি থানায় এ সমীক্ষা পরিচালিত হয়। জাতীয় টিকা দিবসের প্রস্তুতি সম্পর্কে পৌরসভার চেয়ারম্যান, অভিভাবক ও টিকাদান কর্মীদের এবং থানার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার গহণ করা হয় এবং টিকাদান কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি, অন্য আরেকটি জরিপের মাধ্যমে কভারেজের তথ্য সংগৃহীত হয়। কভারেজ বাদে অন্যান্য বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয় ১৫-১৬ এপ্রিল এবং ১৫-১৬ মে। আর কভারেজের তথ্য সংগৃহিত হয় ১৬ এপ্রিল ও ১৬ মে এর পরে।

সরবরাহ এবং সাংগঠনিক বিষয়

থানা ও পৌরসভা পর্যায়ে প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে, তারা প্রাক প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত সকল কাজ সময়মত সমাধা করতে পেরেছেন। এ সাফল্য সত্ত্বেও দূর্গম এলাকাসমূহের জন্য নেয়া বিশেষ পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের প্রয়াসে ঘাটতি দেখা গেছে। যদিও টিকাদান ও সামাজিক সচেতনতার জন্য পরিকল্পনা নেয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু অঞ্চল ভিত্তিক কভারেজের বৈষম্য দেখে মনে হয়েছে যে, এগুলো তেমন কার্যকর হয়নি। যেমন, কিশোরগঞ্জ জেলায় (হাওড় এলাকা) পোলিও টিকা খাওয়ানোর হার নিয়মিতভাবে কম লক্ষ্য করা গেছে। দু'একটা ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বক্ষেত্রে লজিষ্টিক সরবরাহ পর্যাপ্ত ছিল। শুধু মাত্র ৮টি থানা ও ২টি পৌরসভায় ভ্যাকসিন কেরিয়া এবং আইসপ্যাকের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। ঐ সব এলাকায় বিশেষ করে আইসপ্যাকের অপ্রতুলতার কারণে টিকার কার্যকারিতা ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক।

সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি হাজার হাজার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, এনজিও ও স্থানীয় সরকারের কর্মী স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেছেন। মূলতঃ জাতীয় টিকা দিবস একটা সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে। টিকা দিবসে মৌলিক বিষয়গুলোর উপর গ্রাম পর্যায়ের সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান পৌরসভা পর্যায়ের সেবা প্রদানকারীদের চেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়েছে। এর কারণ হিসাবে দেখা গেছে যে, সাক্ষাৎদানকারী গ্রাম পর্যায়ের ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে মাত্র ৫ জন ট্রেনিং পেয়েছেন। অপরদিকে পৌর এলাকায় ৬ জনের মধ্যে ৪ জন ট্রেনিং পেয়েছেন। ট্রেনিং ছাড়াও উপযুক্ত পরিবেশ এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাবকে দায়ী করা যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৯৯৬ সালের টিকা দিবসের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর ফলে খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের রেজিস্ট্রেশন ব্যাহত হয়েছে।

শতকরা ১০ ভাগের বেশি থানা এবং পৌরসভা পর্যায়ের টিকা কেন্দ্রগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য কোন ধরনের প্রতীক ব্যবহার করা হয়নি। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ১০ ভাগ টিকাদান সেশন গাছের নিচে

অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে টিকার কার্যকারিতা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। যদিও প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ২ জন করে পরিদর্শক গড়ে ২ মিনিট ধরে পরিদর্শন করেছেন। গ্রামের ২৮% এবং পৌর এলাকার ২২% কেন্দ্রে কোন পরিদর্শকই যাননি। গ্রাম পর্যায়ের কেন্দ্রে পরিদর্শকদের প্রায় সকলেই শুধুমাত্র রেকর্ডিং ও ট্যালি সিট দেখেছেন। অন্যদিকে পৌর এলাকার পোলিও টিকা ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের স্টক দেখেছেন। কেন্দ্র পর্যবেক্ষণকালে দেখা গেছে যে, প্রায় সব টিকাদানকারীই দু'ফোঁটা পোলিও টিকা নিপুণভাবে খাওয়াতে পেরেছেন।

টিকাদান সম্পর্কে অভিভাবকদের জ্ঞান

গ্রাম পর্যায়ের বেশিরভাগ অভিভাবক টিকা দিবসের সঠিক তারিখ জানতেন না। কিন্তু পৌর এলাকায় এর চিত্র বিপরীত। টিকা দিবসের আগের দিন এবং টিকা দিবসের দিনে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, টিকা সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন, টিকার নাম, টিকা দেয়ার উদ্দেশ্য, লক্ষীভূত শিশুর বয়স, গ্রামের চেয়ে পৌর এলাকায় ভাল ছিল। এ ছাড়া পৌর এলাকার ৫০% এবং গ্রাম এলাকার ৪৪% অভিভাবকগণ বলতে পেয়েছেন যে, ২ রাউণ্ডে টিকা ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপছুল একই সাথে দেয়া হবে। তবে সার্বিকভাবে টিকা এবং ভিটামিন এ' ক্যাপসুল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আশাপ্রদ ছিল না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন দশটি এলাকায় জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ১ম রাউণ্ডে প্রায় ৭৯% শিশু এবং ২য় রাউণ্ডে ৮১% শিশু পোলিও টিকা খেয়েছিল। আর উভয় রাউণ্ডেই খেয়েছিল এমন শিশুর হার ৬৯%। দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রায় শতকরা ৭৩ ভাগ শিশু (১-৫ বৎসর) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেয়েছিল। এলাকাভিত্তিক পোলিও টিকা খাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে যেমন, কুষ্টিয়া ৯০% অন্যদিকে দূর্গম এলাকা কিশোরগঞ্জে মাত্র ১৫%।

এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, যে সকল শিশু ২ ডোজ পোলিও টিকা পেয়েছে তাদের জন্য ২১ টাকা খরচ হয়েছে এবং যে সকল শিশু ১ ডোজ পেয়েছে তাদের জন্য খরচ হয়েছে ৯ টাকা। অল্প পরিমাণ অর্থ তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ, আপ্যায়ন, যাতায়াত ইত্যাদির জন্য স্থানীয়ভাবে যোগাড় করে খরচ করা হয়েছিল।

সাফল্যজনকভাবে ১৯৯৬ সালের টিকা দিবসগুলো পালিত হলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশুই ২ ডোজ পোলিও টিকা খায়নি। এজন্য পোলিও নির্মূল কর্মসূচি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই আগামী টিকা দিবসসমূহের সাফল্যের জন্য সব ধরনের পদ্ধতিগত কাজের ধারাকে সংগঠিত করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের সঠিকভাবে নিয়োগ এবং ট্রেনিং দেয়া, কোল্ডচেইনের উপকরণসমূহ যথাযথভাবে সরবরাহ করা এবং তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযাগ উপকরণসহ ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়াও সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে এ কর্মসূচিতে আরো অধিক হারে অংশগ্রহণ এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচির মূল্যায়ন[14]

ফিরোজ এম কামাল, আব্দুলাহেল হাদী ও এ এম আর চৌধুরী।

দেশের জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে টিকাদান কর্মসূচির ভূমিকা সফল হিসেবে বিবেচিত। এই টিকাদান কর্মসূচির সফলতার কারণে দেশে শিশু মৃত্যুর হারও উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্যান্য ক্ষেত্রের চাইতে টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য অনেক বেশি। দেখা গেছে, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাধা-বিপত্তিও অনেক কম। তবে এই টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিদেশী সাহায্যে। তাই বিদেশী সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে দেশের মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে এই প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করবে কিনা সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা সময় এসেছে। জনগণের মধ্যে এই সচেতনতা এই মুহূর্তে জাগিয়ে তোলা দরকার যাতে তারা তাদের সন্তানদের মঙ্গলার্থে অর্থ ব্যয়ে টিকাদানে উদ্বুদ্ধ হয়। এই বিষয়ে দেশের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ কোন বিশেষ ভূমিকা রাখে কিনা, কিংবা ভূমি-সম্পদ অর্জন বা বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা থাকতে পারে কিনা তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়।

ব্র্যাক দেশের ১০টি জেলার ৭৫টি গ্রামে টিকাদান কর্মসূচির উপর একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। এই সমস্ত এলাকায় ব্র্যাকের বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেমনঃ ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে ঋণদান, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই টিকাদান কর্মসূচির কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে নানাদিক গবেষণার অন্তর্ভূক্ত ছিল। গবেষণার জন্য এলাকার মধ্য থেকে ১২-২৩ মাস বয়সী সন্তানের ১,১৪৬ জন মা'কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সন্তানের লিঙ্গ, পিতার শিক্ষা, খানায় কৃষি জমির পরিমাণ ও ঘরে রেডিও থাকা ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, তালিকাভুক্ত ১,১৪৬ জন মায়ের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬৪.৩টি শিশু দরিদ্র পরিবারভুক্ত অর্থাৎ যাদের ৫০ শতাংশের কম জমি রয়েছে। আবার এদের মধ্যে শতকরা ৪৫.২টি পরিবারের কেউ না কেউ দিন মজুর হিসেবে কাজ করে। শতকরা ৫৯.২টি শিশুর মাতা ও শতকরা ৫৭.৮টি শিমুর পিতা নিরক্ষর। এই সমস্ত পরিবারে ১২-২৩ মাস বয়সের শতকরা ৭৮টি শিশু সব টিকা গ্রহণ করেছে। এক্ষত্রে 'বিসিজি' টিকা গ্রহণের হার অন্যান্য টিকার চাইতে বেশি (শতকরা ৯৪.৭)। ডিপিটি গ্রহণের হার শতকরা ৪৬.৮, পোলিও শতকরা ৪৭.৫ ও হাম শতকরা ৭৯.৪।

দেখা গেছে, মাতা-পিতার শিক্ষা গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে শিশুর টিকা গ্রহণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মাতার শিক্ষা পিতার শিক্ষার চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ দেখা গেছে। তবে টিকা গ্রহণের বেলায় ভূমিহীন কিংবা ভূমি আছে এমন পরিবারের তেমন উলেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

কম খরচে টিকা গ্রহণ করার পক্ষে মত বেশি। দেখা গেছে, ১০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষেই বেশিরভাগ মতামত দিয়েছেন। এই বিষয়ে মাতা-পিতার শিক্ষা তেমন কোন আলাদা ভূমিকা রাখেনা।

---

[14] "Differentials of the immunization programme in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জানুয়ারি ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন বিমল গুহ।

অর্থাৎ ন্যূনতম ব্যয়ে এই টিকা গ্রহণের পক্ষে শিক্ষা ও স্বচ্ছলতা নির্বিশেষে অধিকাংশের মত এক। তবে যে সব পরিবারে রেডিও আছে তারা এই টিকাদানের সুফল সম্পর্কে অধিক অবহিত ও বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, টিকাদান কর্মসূচি সফলতার ক্ষেত্রে মাতা-পিতার শিক্ষা বেশ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। শিক্ষা গ্রহণের ধাপ বৃদ্ধি হলে মাতাপিতা অধিক সচেতন হন এবং শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন বেশি। এক্ষত্রে ভূমিহীন বা ভূমির অধিকারী হওয়ার সাথে এই সফলতার সম্পর্ক ক্ষীণ। রেডিও যেহেতু একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ প্রচার মাধ্যম তাই এক্ষেত্রে রেডিও অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে। তাই গরীব জনগণ যা'তে কমমূল্যে তাদের ক্রয়সীমার মধ্যে রেডিও সংগ্রহের সুযোগ পায়, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। দেখা গেছে, প্রচারের ফলে ও বিনামূল্যে টিকা গ্রহণের সুযোগের কারণে এক্ষেত্রে সন্তোষজনক সুফল পাওয়া গেছে। এই টিকাদান কর্মসূচি যেহেতু একটি ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং দেশের জনগণের অনেকে এই বিষয়ে সচেতনতা লাভ করতে সক্ষম, সেহেতু এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখা আবশ্যক। যদি দাতা সংস্থা বিনামূল্যের এই সুযোগ বন্ধ করে দেয় সেক্ষেত্রে এই কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার বিকল্প চিন্তার সময় এসেছে। এই কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কিংবা সরকারি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ০-১১ মাস বয়সের শিশুদের টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, কিছু নির্ধারিত স্থান চিহ্নিত করে এবং প্রয়োজনে টিকাদানের সময়সূচি পরিবর্তন করে স্থানীয় পর্যায়ে তদারকীর মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। মাতা-পিতার শিক্ষার ধাপ যেহেতু এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে তাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থানীয় তৃণমূল পর্যায়ে কার্যরত বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় সংগঠন ও সরকারের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে এই টিকাদান কর্মসূচিকে অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্র্যাকের এ আর আই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ[15]

ফিরোজ মাহবুব কামাল

এআরআই (Acute Respiratory Tract Infection -- ARI) শিশুদের একটি অতি তীব্র শ্বাসরোগ। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস এবং শ্বাসনালী ও ফুসফুসের প্রদাহ জাতীয় রোগসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত। এক বৎসরের নীচে যত শিশু মারা যায় তাদের শতকরা প্রায় ২৭ ভাগই এ রোগের শিকার। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়ার পরেই এ রোগে মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ। একটি হিসাবে দেখা গেছে, রোগটি বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার শিশুর জীবন কেড়ে নেয়।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ গ্রামে বাস করে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দরিদ্র এবং এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটায়। স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধা তাদের নাগালের বাইরে। এই বঞ্চিত মানুষদের সার্বিক স্বাস্থ্যমান বাড়ানোর জন্য ব্র্যাকের নিজস্ব স্বাস্থ্য কর্মসূচি রয়েছে। এআরআই নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ এই কর্মসূচির অংশ বিশেষ।

ব্র্যাক ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নবজাতক ও শিশুদের এআরআইজনিত রুগ্নতা ও মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে এআরআই কর্মসূচি আরম্ভ করে। ব্র্যাক এক্ষেত্রে গ্রামের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীরূপে নিয়োজিত করেছে। এরা ‘স্বাস্থ্য সেবিকা’ নামে পরিচিত। কর্মসূচি এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এদের নিয়োগ করা হয়। এরূপ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সুবধিাগুলির মধ্যে রয়েছে – স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেবার হার খুব কম; কম খরচে এদের সেবা পাওয়া যায়; এবং উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট এরা পরিচিত এবং গ্রহণীয়।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের এআরআই সংক্রমণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, গ্রামভিত্তিক চিকিৎসার প্রসার ঘটানো এবং শতকরা ৭৫ ভাগ এআরআই রোগীকে যথাপোযুক্ত চিকিৎসকের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করা, এবং ওষুধের পরিমিত ব্যবহারে উৎসাহ দান, এআরআই নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির লক্ষ্য বাস্তবে কতখানি অর্জিত হচ্ছে এবং কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, এসব বিষয়ে মূল্যায়ন করার জন্য এ গবেষণাটি হাতে নেয় হয়েছে। উপরন্তু, কর্মসূচির দক্ষ পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা; কর্মসূচির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশোধনকারী কৌশল উদ্ভাবন; এবং নির্বাচিত কৌশল বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রয়োগ উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দিনাজপুর সদর থানার কর্মসূচি এলাকায় তিন বছরের কম বয়সের সকল শিশুর মা এবং এখানে কর্মরত সকল স্বাস্থ্য সেবিকার উপর সমীক্ষা চালানো হয়েছে। দিনাজপুরের তিনটি কর্মসূচি এলাকার প্রত্যেকটি

[15] “Enhancing the effectiveness of acute respiratory tract infection control programme of BRAC” শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জেড এ এম ওয়াহিদুল হক।

হতে নির্বাচিত অনধিক তিন বছর বয়সের শিশুর তিনজন মা এবং তিনজন স্বাস্থ্য সেবিকার অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার; এবং প্রতি এলাকা হতে ৬-৭ জন মা এবং ১৪-১৫ জন স্বাস্থ্য সেবিকার সঙ্গে বিষয় ভিত্তিক দলীয় আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মসূচির ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার, কর্মসূচির বিভিন্ন স্তরে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য নেয়া হয়েছে। উপরন্তু, এআরআই প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপাত্তও এতে ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্র্যাকের এই প্রচেষ্টা উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠিকে এআরআই কর্মসূচি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করতে অনেকটা সফল হয়েছে। ব্র্যাক এ কর্মসূচির জন্য পর্যায়ক্রমে সরকারের সহায়তা আদায় করতেও সক্ষম হয়েছে। আগে কেবলমাত্র এ সর্মসূচির সংশিষ্ট ডাক্তারদের সরকার প্রশিক্ষণ দিত, কিন্তু বর্তমানে এ কর্মসূচির প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধ সরবরাহ করতে সরকার সম্মত হয়েছে। যদিও ডাক্তারের সংখ্যা প্রতি ৯০ হাজার রোগীর জন্য মাত্র একজন।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলীর সাথে এর বাস্তবায়নের কৌশল পর্যাপ্ত বলে এ গবেষণাকর্মে মন্তব্য করা হয়েছ। এতে বলা হয়েছে, যথাসময়ে ডাক্তার, কর্মসূচি সংগঠক, স্বাস্থ্য সেবিকা নিয়োগ করা হয়েছে। এবং এআরআই এর বিভিন্ন দিক, যেমন এ রোগ উদ্ভবের কারণ, রোগ সনাক্তকরণ এবং এর ব্যবস্থাপনার উপর তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও রোগ সনাক্তকরণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ রুগীদের যথোপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর সুবিধার্থে বিশেষ কার্ড পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরাসরি বাজার থেকে বা দাতাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, ফিডব্যাক পদ্ধতি, বিশেষ করে রোগ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বলে উলেখ করা হয়েছে। এ গবেষণা এআরআই কর্মসূচির নিম্নোলিখিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করেছেঃ

- কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সংখ্যা যথেষ্ট নয়।
- গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র ও ‘রেফারাল সেন্টার’ নেই।
- স্বাস্থ্য সেবিকাদের ইনসেনটিভ অপর্যাপ্ত।
- একটি মাত্র অসুখের আরোগ্য-সহায়ক পরিচর্যা চালু রয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবিকাদের কারিগরি দক্ষতা অপর্যাপ্ত।
- তত্ত্বাবধায়কের অভাব।
- প্রাতিষ্ঠানিক পদসোপান সুদীর্ঘ।

পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় এআরআই কর্মসূচির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে গবেষণায় সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে। যেমনঃ

- সেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বাস্থ্য সেবিকাদের উপর গ্রাহকদের আস্থার অভাব ক্রমেই বাড়ছে।

- গ্রাম-স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের পরিচর্যায় জড়িত হবার ব্যাপারটি বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় চিকিৎসাজীবী ও গ্রামীণ ওষুধ বিক্রেতারা বৈরী চোখে দেখছেন।

- পরিবেশ দূষণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং অপচিকিৎসকরা নকল ওষুধ নিয়ে বাজারে আসছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত এআরআই কর্মসূচির কয়েকটি ইতিবাচক প্রবণতা নিম্নরূপঃ

- গ্রামের মানুষদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে তারা সরকারি স্বাস্থ্য সেক্টরের সুযোগ সুবিধায় নিজেদের অংশীদার করতে উৎসাহী হয়ে উঠছে।

- বেসরকারি সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মকাণ্ডে সংশিষ্ট হবার জন্য সরকার উৎসাহ দিচ্ছে।

- স্বাস্থ্য প্রকল্প অর্থায়নের দাতাগোষ্ঠী অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

- হাতুড়ে ডাক্তার, ঝাড়-ফুক পেশাজীবী এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণবিহীন চিকিৎসকরা ক্রমশঃ প্রতিযোগিতার সামর্থ হারাচ্ছেন।

এ গবেষণার মাধ্যমে এআরআই প্রতিরোধ কর্মসূচির প্রায়োগিক দিকসমূহ পরীক্ষা করে এর শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ সনাক্ত করা হয়েছে। তিনটি কর্মকৌশল প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং এর মধ্যে অন্তত: একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা যাচেছ।

কর্মসূচির শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য সেবিকারা গ্রামেই থাকেন তাই গ্রামের মানুষ সহজেই তাদের কাছে যেতে পারেন। এদের কাজ ছেড়ে দেয়ার হার কম। তাছাড়া রুগীর চিকিৎসার ব্যয়ও স্বল্প। ভবিষ্যতে এ কর্মসূচির বিকাশের অনকূল অবস্থা রয়েছে। এর দূর্বলতাসমূহের মধ্যে রয়েছে – ডাক্তারের মতামত গ্রহণ ও তত্ত্বাবধানের সুযোগ কম। অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত স্বাস্থ্য সেবিকারা এআরআই সম্পর্কিত দরকারি সমস্ত বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম নন। এআরআই কর্মসূচির কার্য সম্পাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোলিখিত তিনটি কর্মকৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) প্রত্যেক আঞ্চলিক দপ্তরের স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রে উপযুক্ত ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর অবদানের সাথে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবিকাদের অবদানকে সমন্বিত করা।

খ) কর্মসূচির সেবাসমূহ বহুমুখী করা যাতে গ্রামের মানুষদের সমস্ত সাধারণ রোগের চিকিৎসা হয়।

গ) স্বাস্থ্য সেবিকাদের কারিগরি দক্ষতার উন্নতি করা।

ব্র্যাক এ তিনটি কৌশলের মধ্যে প্রথমটি অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নিয়েছে। বগুড়া ও দিনাজপুর সদর – এই দু'টি থানায় ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর হতে ১৯৯৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত এটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে।

উপসংহার

গ্রামীণ এলাকায় নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য এআরআই প্রতিরোধ কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটি অব্যাহত রাখতে হলে মাঝারি ও গুরুতর শ্বাসকষ্টে রুগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। এভাবেই কর্মসূচিটি কার্যকর হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ অব্যাহতভাবে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের আওতায় রাখা দরকার। এই তত্ত্বাবধান হওয়া উচিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকৎসকদের দ্বারা। উল্লেখ্য যে, কোন এলাকাতেই এককভাবে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। এআরআই এর সঙ্গে ডায়রিয়া, হাম এবং অন্যান্য রোগও দেখা দিতে পারে।

এআরআই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদেরও নিয়োজিত করা আবশ্যক। উপরন্তু, গ্রামীণ এলাকার কাছাকাছি তাদের অবস্থান করা প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোকে হতে হবে গ্রামীণ মানুষের অতি নিকটে। এ ধরনের কেন্দ্র কর্মসূচির সমস্ত সুবিধার স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্ঠি করবে। প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিসে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্বাস্থ্য সেবিকাদের জন্য 'রেফারাল সেন্টার' হিসেবে কাজ করবে। এই কেন্দ্রের আবাসিক চিকিৎসক শ্বাসরোগ সনাক্তকরণ ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে 'ফিডব্যাক' নেবেন।

এই গবেষণা কার্যক্রমটি ব্র্যাকের এআরআই প্রতিরোধ কর্মসূচির প্রয়োগ পদ্ধতির সমস্যাবলী তুলে ধরেছে এবং এর সংশোধনকারী কর্মকৌশল ও তা বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় যারা স্বাস্থ্য সেবার কাজ করছেন এটি তাদের উপকারে আসতে পারে। এছাড়া, স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে কৌশলগত ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণায় অগ্রহী ব্যক্তিদের জন্যও একটি দিক নির্দেশকরূপে কাজে আসতে পারে। কেননা, এ বিষয়ে গবেষণা বাংলাদেশে এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে।

মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা[16]

আমিনা মাহবুব ও সৈয়দ মাসুদ আহমদ

মহিলাদের স্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কিন্তু বাংলাদেশে অতীতকাল থেকেই এই দিকটি অবহেলিত হয়ে আসছে।

দেখা গেছে, নিজেদের স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে মহিলাদের নিজস্ব ধারণা রয়েছে। সুস্থতা এবং অসুস্থতা নিরূপণে তাদের নিজেদের একটা মাপকাঠি রয়েছে এবং সেই ধারণার সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন মিল নাও থাকতে পারে। মহিলাদের অসুস্থতা সম্পর্কিত ধারণা এবং তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত আচরণ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সেকারণেই মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দৃষ্টি ভঙ্গি অনুধাবন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি যৌথ উদ্যোগে একটি গবেষণা চালিয়েছে মতলব থানার বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে। ঐ মহিলারা তাদের অসুস্থতাকে কী দৃষ্টিতে দেখে থাকে, কয়েকটি বিশেষ ধরনের রোগে সুস্থতা লাভের জন্য তারা কী চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে, রোগের কারণ সম্পর্কে তাদের অনুমান ও বিশ্বাস, এবং গ্রামীণ রোগতত্ত্ব নিরূপণের জন্য এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে।

মতলব থানার চরনিলক্ষ্মী গ্রামের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঐ গ্রামের মহিলাদের অসুস্থতা সম্পর্কে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তারা যখন কোন কাজ করতে পারে না এবং বাধ্য হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিতে হয়, তখনই কেবল তারা নিজেদের অসুস্থ বলে মনে করে। গ্রামের মহিলারা তাদের অসুস্থতার একটি লম্বা তালিকায় ১১০টি রোগের নাম উল্লেখ করে। সব অসুখগুলিকেই তারা স্থানীয় নামে অভিহিত করে। এই তালিকায় জ্বর, সর্দি, কাশি তাদের খুবই পরিচিত অসুখ হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া তারা বিভিন্ন স্ত্রীরোগ সম্পর্কেও বলে যেমন: অনিয়মিত রক্তস্রাব বা অতিরিক্ত রক্তস্রাব। তবে এগুলির অবস্থান তালিকার অনেক নিচে ছিল। যাহোক, এর অর্থ এই নয় যে ঐ গ্রামে মহিলারা এই সমস্ত অসুখে কম ভোগে, কারণ পরবর্তীতে বিভিন্ন আলোচনা ও কেস স্টাডিতে এই সমস্ত অসুখগুলির উল্লেখ বারবার করা হয়েছে। ধারণা করা যায় যে, বিশেষতঃ লজ্জার কারণেই মহিলারা তালিকার শুরুতেই এই সমস্ত রোগের কথা উল্লেখ করে নাই। প্রসব সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে প্রায় সব গর্ভবতী ও নতুন মায়েরা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেছে সুতিকা ও আধলার কামড়ের (প্রসব উত্তর তলপেট ব্যথা) কথা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, গুরুত্ব নির্ধারণে মহিলারা জীবনের প্রতি হুমকি প্রদানকারী রোগগুলিকেই অগ্রাধিকার দেয়। এক্ষেত্রে তারা ডায়রিয়া ও যক্ষ্মাকে সবচেয়ে মারাত্মক অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারা বলেছে ডায়রিয়া হলে চিকিৎসার কোন সময় পাওয়া যায় না এবং রোগী হঠাৎ করেই মারা যায়। যক্ষ্মার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য বলে তারা মনে করে। তাদের মতে এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই এবং এটা সংক্রামক। যক্ষ্মা রোগী শেষ পর্যন্ত মারা যাবেই। এরপর তারা বাতাস লাগা ও গর্ভপাতকে মারাত্মক অসুখ বলে মনে করে। তাদের ব্যাখ্যা ছিল অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও গর্ভপাত হলে রক্তহীনতার

[16] "Perspective of women about their own illnes" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শাহানা হুদা।

কারণে রোগীনী মারা যায় এবং এ দুটি রোগেরই কারণ হলো বাতাস লাগা। গ্রামীণ মহিলারা ঐ জাতীয় অসুখগুলিকে মধ্যম প্রকারের বলে মনে করে যাতে রোগী মারা যায় না এবং দীর্ঘ দিন ধরে ভুগতে থাকে এবং এগুলির চিকিৎসা আছে। উদাহরণ হিসেবে তারা সুতিকার কথা উল্লেখ করে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অসুখগুলি তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মকে ব্যাহত করে না। আর যেসব অসুখে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি হয়, এবং অল্প সময়ের জন্য হয়, সেগুলোকে 'সহজ অসুখ' বলে মনে করে মহিলারা, যেমন ঠাণ্ডালাগা, গা ব্যথা, মাথাব্যথা, চুলকানি, ফোঁড়া এবং চর্মরোগ। এ ধরনের রোগে চিকিৎসক বা কবিরাজের কাছে যেতে হয় না। মহিলারা বাসাতেই এর চিকিৎসা করে এবং মাঝে মাঝে চিকিৎসাই করতে হয় না।

সমীক্ষায় দেখা যায় মহিলারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও যুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন অসুখগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এভাবেই তারা মনে করে সাদা স্রাব, পদ্মরোগ ও প্রস্রাবের সংক্রমণের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। তাদের ব্যাখ্যা ছিল সাদা স্রাব থাকলে পদ্মরোগ হতে পারে, আবার যে সমস্ত মহিলাদের সাদা স্রাব আছে তারা প্রস্রাবের সংক্রমণেরও ভুগতে পারে। কারণ এই দুটি অসুখই প্রধানতঃ শরীর কষে যাওয়া থেকে হয়। একইভাবে তারা জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথা ব্যথার মধ্যেও সম্পর্ক তৈরি করেছিল। এভাবে আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণের মাধ্যমে তারা অসুখগুলিকে ৯ প্রকারে ভাগ করেছিল।

গবেষণা এলাকার মহিলাদের ছোট বড় সতস্ত অসুখ সম্পর্কেই নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা আছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তারা অসুখের কারণ খুঁজে বার করে এবং একটি প্যাটার্ন দাঁড় করায়।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অসুস্থতাঃ মহিলারা সাধারণতঃ শ্বেতস্রাব, ডিসমেনরিয়া, পেশাবে সংক্রমণ, ঋতুকাল অল্প বা অধিক রক্তপাত এবং অনিয়মিত মাসিক এসব রোগে ভুগে থাকে। এসব অসুখের মধ্যে শ্বেতস্রাব রোগটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। স্থানীয় ভাসায় একে মেহ অবথা কিচ মেহো বললেও মাঝেমাঝে সাদা স্রাব বলে থাকে। তারা মনে করে শরীরে চাহিদামতো তরল পদার্থের অভাব দেখা দিলে সাদা স্রাব হয়। এছাড়া খাবারের অভাব এবং দুর্বলতার কারণেও এরোগ হয়। সাদা স্রাব হলে তাদের বমি বমি ভাব হয়, ক্ষুধা চলে যায় এবং দুর্বলবোধ করে।

এরপর তার ডিসমেনোরিয়া অর্থাৎ কালের চোট অসুখের কথা বলেছে। মাসিক চলাকালে তলপেট খুব ব্যথা হয় এবং কালো জমাটবাধা রক্ত বের হয়। গ্রামের মেয়েরা মনে করে এ রোগ হলে গর্ভধারণ করা সম্ভব হয় না। 'কাল' নামে শয়তানের দৃষ্টি কারণে রোগ হয় বলে তার বিশ্বাস করে। গ্রামে মহিলারা শয়তানের দৃষ্টির কারণে রোগ হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। গ্রামে মহিলারা জানিয়েছে, এই রোগে পেশাবের রাস্তা জ্বলে, তলপেট ব্যথা হয় এবং মাঝে মাঝে শরীরও জ্বলে। অনেকে মনে করে যথেষ্ট খাবারের অভাবে এ রোগ হয়, আবার অনেকে মনেকে সাদা স্রাবের কারণে।

চরনিলক্ষ্মী গ্রামের মহিলারা এবং ধাত্রীরা গর্ভ ও প্রসব সংক্রান্ত রোগকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, কিছু বাচ্চা হওয়ার আগে ও কিছু বাচ্চা হওয়ার পরে। বাচ্চা হওয়ার পরের সমস্যাটাই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে গর্ভপাত হওয়ার আশংকা তাদের মধ্যে বেশি দেখা গেছে। এছাড়া রয়েছে মৃত বাচ্চা হওয়া, প্রসবের সময় বাচ্চার সঙ্গে মায়ের নাড়ি-ভুড়ি বের হওয়া, মায়ের পেটে বাচ্চার উল্টো অবস্থান, প্রসবের পর তলপেট ব্যথা, জরায়ুতে সংক্রমণ, সূতিকা। প্রতিটি রোগেরই স্থানীয় নাম রয়েছে। তারা

মনে করে জ্বীন-ভূতের আছর লাগলে গর্ভপাত ও মৃত বাচ্চা হয়। অন্যান্য রোগের কারণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে এবং এসব সারানোর জন্য তারা মৌলভী ও কবিরাজের কাছে সাধারণত: গিয়ে থাকে। গর্ভধারণ ও প্রসব পরবর্তী অসুস্থতা রোধের জন্য গ্রামের মেয়েদের কঠিন নিয়মকানুন অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে বলা হয়। তবে অনেক গ্রামীণ মহিলা আছে, যারা মনে করে গর্ভাবস্থায় কঠোর পরিশ্রম ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও খাদ্যের অভাবে এসব অসুবিধা হয়। পাকস্থলী সংক্রান্ত সমস্যা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রামের মহিলারা পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাওয়া ও পাইলসের নাম করেছে। লিবার নামের আরেকটি অসুখের কথা বলেছে, এই রোগের উপসর্গ পেটের উপরের অংশে দারুন ব্যথা হয়। অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে এই রোগ হয় বলে তাদের ধারণা। এছাড়া তারা এসিডিটি সমস্যার কথাও বলেছে।

বিভিন্ন ধরনের অপশক্তির কুপ্রভাবে নানা ধরনের অসুখ হয়ে থাকে বলে গ্রামীণ মহিলারা মনে করেন। তারা একে জ্বীনে ধরা, ভূতে ধরা, বাতাস লাগা, ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। জ্বীন-ভূতে ধরলে বা বাতাস লাগলে মেয়েরা আলুথালু বেশে খোলাচুলে, অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে ঘোরাফেরা করে। তারা খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো করে না। চিকিৎসার জন্য এদের পানিপড়া, তাবিজ ও কবিরাজী ঔষধ দেয়া হয়। এছাড়া গ্রামের মহিলাদের নানা ধরনের চর্মরোগ হয়ে থাকে। এক ধরণের পোকার কামড়ে বিচকোট রোগ হয়। এতে পুরো হাত ফুলে ও পেকে যায়। পিচতল বলে পিঠে ঘায়ের মতো অসুখ হয়। নখ চিবি হলে নখের কোণা কালো হয়ে পেকে যায় ও পুঁজ বের হয়। সাধারণত: কাদা ঘাটলে এ রোগ হয়। এছাড়া মহিলারা চর্মরোগের জন্য অপরিচ্ছন্নতাকে দাবী করেছে।

গ্রামের মহিলারা বিশ্বাস করে তাদের বিভিন্ন রোগের পেছনে বাতাস লাগা, দৃষ্টিলাগা, কাঁকড়া মাটি, গরম ও ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার, পাক-নাপাক, দুর্বলতা, নষ্ট করা, কষা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এগুলো যেন কোন মহিলার উপর কাজ না করে এজন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ, নিয়ম-কানুন। এগুলো মেনে না চললে মহিলাদের অসুস্থ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

মহিলাদের রোগ নির্ণয়ের কিছু ধরন আছে। তারা বিভিন্ন ধরনের অসুখের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের অসুস্থতার তুলনা করে এবং মা, দাদিসহ পরিবারের বয়স্ক মহিলাদের, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে। তবে মহিলারা নিজেদের বাবার বাড়ির লোকদের সঙ্গে অসুস্থতা বিষয়ে কথা বলতে যতোটা সহজবোধ করে, শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে ততোটা সহজবোধ করেনা। প্রাথমিকভাবে নিজেরা রোগ নির্ণয়ের পর মহিলারা হাতুড়ে ডাক্তার, মৌলভী, কবিরাজ, দাই, ভেষজ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে যায়। তবে তারা চিকিৎসকের কাছে খুব কম যায় এবং কয়েকটি বিশেষ ধরনের অসুখের জন্য কবিরাজের কাছে সবচেয়ে বেশি যেয়ে থাকে। সাধারণত: লোকমুখে চিকিৎসার কথা শুনে তারা নির্ধারণ করে কোথায় কার কাছে যাবে। খুব মারাত্মক না হলে অসুখের চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করে না। কিছু মহিলা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসাও গ্রহণ করে থাকে, কেউ কেউ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য মতলব থানাসদরেও যায়। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকারা ১০টি রোগের জন্য এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়। ব্র্যাকের চিকিৎসা সুবিধা সম্পর্কে গ্রামের মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। তারা মনে করে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকারা যদি তাদের কয়েকটি গোপন অসুখের জন্য ঔষধ দেয় তাহলে তারা চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও যাবে না।

সমীক্ষা থেকে একটি বিষয় বোঝা গেছে, নিজেদের অসুস্থতা, অসুস্থতার ধরন, মাত্রা এবং কখন চিকিৎসা নিতে হবে এ ব্যাপারে গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব ধারণা আছে। তবে তারা একটি রোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রামে মহিলাদের সার্বিক অসুস্থতাও চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি মূলতঃ নির্ভর করে ঐ অসুস্থতা সম্পর্কে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এজন্য যেসব অসুখ সম্বন্ধে সামাজিক কলঙ্ক জড়িত, সেসব অসুখ তারা গোপন করে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মহিলাদের বিশেষ কিছু রোগের উপর তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আরো ব্যাপক গবেষণা করা যেতে পারে। এটা মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নতুন পন্থা গ্রহণের সাহায্য করবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অসুখে ভুগছে কিন্তু সামাজিক কলঙ্কের কারণে প্রকাশ করতে পারছে না ঐ সমস্ত দুস্থ মহিলাদের সাহায্য করতে পারে ব্র্যাক। স্বাস্থ্য সেবিকারা তাদের এব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে পারে।

প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডকৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন[17]

আহমেদ আলী, শাহ নূর মাহমুদ, মো. নজরুল ইসলাম ও ফজলুল করিম

ব্র্যাকের 'মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি'র নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি'। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯১ সন থেকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেমন: শিশুদেরকে টিকা দেয়া, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণে সহায়তা করা এবং গ্রোথ মনিটরিং ইত্যাদি। তবে কর্মসূচির চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত এবং অবহেলিত অংশ, বিশেষ করে মহিলাদের জীবনধারা তথা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা। এ কাজ ময়মনসিংহ, বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলের ১০টি থানার ৩০টি এলাকায় পরিচালনা করা হয়।

এ কর্মসূচিতে ব্র্যাকের মাঠ কর্মীগণ কাজ করেন। তারা ৩০টি এলাকার লক্ষীভূত এবং লক্ষ্যবহির্ভূত পরিবারগুলোর মধ্যে জীবিতজন্ম, মৃতজন্ম ও মৃত্যুর উপাত্ত লিপিবদ্ধ করে। এ কাজের উদ্দেশ্য হলো কার্য এলাকায় জনসংখ্যার যে পরিবর্তন হচ্ছে তা নিরূপণ করা। সুতরাং কর্মসূচির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবিতজন্ম, মৃতজন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা সংশিষ্ট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা।

এ প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৯৫ সনের এপ্রিল-মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়। কার্য এলাকার লোকজনের মধ্যে জীবিতজন্ম, মৃতজন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা নির্ভুলভাবে রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখা এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের দু'টি দল এ সমীক্ষার কাজে অশগ্রহণ করে। সমীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি গ্রাম নির্বাচন করা হয় গত ১৯৯৪ সনের ১৫ই মার্চ থেকে ১৯৯৫ সনের ১৪ই মার্চ পর্যন্ত এক বৎসর সময়ের মধ্যে নির্বাচিত গ্রামে খানাসমূহে জীবিতজন্ম, মৃতজন্ম ও মৃত্যুর উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং তা কর্মসূচির রেকর্ড/রেজিস্টারের সাথে যাচাই করা হয়।

ফলাফলে দেখা যায়, মাঠকর্মীগণ জীবিতজন্ম, মৃতজন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির যত রকম তথ্যের রেকর্ড করেছেন, সেগুলোর মধ্যে সময়ান্তরে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। জীবিতজন্ম নির্ভুল করার রেকর্ড করার কাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে মৃতজন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডের কাজের মধ্যে উন্নয়ন ঘটলেও তা তেমন গুরুত্বপূর্ণভাবে ঘটেনি।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ সমীক্ষার মাধ্যমে মোট ৪১৯টি জীবিতজন্মের তথ্য পাওয়া যায়, যার মধ্যে কর্মসূচি ৩৪৮টি (৮৩%) তথ্য রেকর্ড করে। এ ফলাফলকে ১৯৯২ সনের ফলাফলের চেয়ে ভাল বলা যায়।

---

[17] "Assessment of birth and death recording activities in Reproductive Health and Disease Control Programme of BRAC" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এম এ কুদ্দুস।

বগুড়া অঞ্চলে এ সমীক্ষায় ২৩২টি জীবিতজন্মের কথা জানা যায়। আর কর্মসূচির মাধ্যমে ২২৪টি (৯৭%) জীবিতজন্মের তথ্য রেজিস্টারভুক্তি করা হয়।

দিনাজপুরে বর্তমান সমীক্ষার মাধ্যমে ২২০টি জীবিতজন্মের কথা জানা যায়, যার মধ্যে কর্মসূচির কর্মীগণ ২০৬টি (৯৪%) জীবিতজন্মের তথ্য রেকর্ড করেন।

সমীক্ষায় অঞ্চল নির্বিশেষে ২৮টি মৃতজন্মের তথ্য রেকর্ড করা হয়, যেখানে এই কর্মসূচির কর্মীগণ ১৫টি (৫৪%) মৃতজন্মের কথা রেজিস্টারভুক্ত করেন। তুলনামূলকভাবে ১৯৯২ সনের ফলাফল থেকে ১৯৯৫ সনের সমীক্ষার ফলাফলে মৃতজন্মের হার বেশি দেখা যায় (১৯৯২ সনে ২%, ১৯৯৫ সনে ৩.১%)।

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মৃত্যর ঘটনার মাত্র এক-চতুর্থাংশ মাঠকর্মীগণ রেকর্ড করেছেন। যেহেতু ব্র্যাকের কর্মসূচিতে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্য রয়েছে সেহেতু মৃত্যুর ঘটনা সঠিকভাবে রেকর্ড না করলে কর্মসূচিভুক্ত থানাগুলোতে মৃত্যুর হার সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। ফলে ব্র্যাকের সেবাদান কার্যক্রমের লক্ষ্য স্থির করার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

জন্ম ও মৃত্যু রেকর্ড করার মধ্যে পার্থক্য থাকার সম্ভাব্য কারণ হলো সংশিষ্ট রেজিস্টারগুলো অনিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ, দুর্বল তদারকি ও কর্মসূচি সংগঠকদের কাজ বেশি। কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্ভাবিত তথ্য নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিটি পর্যায়ের কিছু জড়িত লোকজনকে উৎসাহমূলক কিছু দান না করাও তেমন অবস্থার একটি কারণ।

প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সার্বিক দৃশ্যপটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্টারভুক্ত করার কাজে উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু কর্মসূচির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের এ বিষয় অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু রেকর্ড করার কাজে তাদের আরো অনেক কিছু করার আছে, যেমনঃ কার্য পরিচালনা ও তদারকির কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, কর্মসূচি সংগঠকগণ নিয়মিতভাবে বসতবাটী পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন রেজিস্টার হালনাগাদ করা হয়েছে কিনা তা তদারককারিগণ নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। জন্মের তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করার জন্য কর্মসূচি সংগঠকগণ সম্ভাব্য জন্মগ্রহণের বিষয়ে খোঁজ রাখার নিমিত্তে সঠিকভাবে দম্পতি ও গর্ভধারণ রেজিস্টার পরীক্ষা করবেন। মৃত্যুর তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করার জন্য কর্মসূচি সংগঠকগণ তথ্য নেটওয়ার্ক অর্থাৎ গ্রাম কমিটি সদস্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের সাথে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করতে পারেন।

প্রসব-পূর্ব সেবার কর্মসূচি সংগঠকের ভূমিকা[১৮]

কাওসার আফসানা, এ এম আর চৌধুরী, শাহ নূর মাহমুদ ও ফজলুল করিম

কোনও কাজে কারও যোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে যে দিকটি বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হয় তা হলে ওই বিষয়টি সম্পর্কে কাজ ও সংশিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগে অনুসৃত পদ্ধতি যা সর্বাধিক কল্যাণ এবং ন্যুনতম ঝুঁকির পরিস্থিতি সৃষ্ঠি করে। স্বাস্থ্যগত সেবা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডেই সর্বত্র বিচার করা হয় প্রতিটি উদ্যোগ ও কার্যক্রমের। সম্প্রতি প্রসব-পূর্ব সেবা দানে ব্র্যাক-এর কর্মসূচি সংগঠকদের যোগ্যতা সম্পর্কে যে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে তাতে প্রাধান্য পেয়েছে ওই মানদণ্ডটিই। উলেখ্য, এ ধরনের একটি সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি গত দু'দশক ধরে বিশ্বব্যাপী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, বাংলাদেশেও এর স্থান রয়েছে অগ্রাধিকারের তালিকায়। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মাতৃত্বকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে বিস্তারিত উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ এদেশে প্রসবকালীন জটিলতার ফলে যত মৃত্যু ঘটে তার বেশির ভাগেরই কারণ যথাযথ জ্ঞান ও যথাব্যবস্থার অভাব। এক্ষেত্রে সেবা ও পরিচর্যার কাজে উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মাতৃত্বের নিরাপত্তা। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি (ডবলিউএইচডিপি)-র মাধ্যমে ব্র্যাক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। এই কর্মসূচির অধীনে প্রসব-পূর্ব সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রসব-পূর্ব সেবা দিয়ে আসছেন কর্মসূচি সংগঠকরা। এই সেবা কার্যক্রম গত পাঁচ বছর ধরে চলছে। কাজেই এর উপযোগিাত কার্যকারিতা ও ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ন ও বিশেষণ জরুরি হয়ে পড়ে। এ আলোকেই বর্তমান সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে।

বস্তুত: কর্মসূচি সংগঠকদের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি কর্তৃক পরিচালিত প্রসব-পূর্ব সেবার মান যাচাই করা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা, অন্তঃসত্ত্বাকালীন সমস্যা সনাক্তকরণ এবং সংশিষ্ট তথ্যাদি প্রদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মসূচিটিকে আরও কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্য নীতিগত ও কৌশলগত বিষয়ে নতুন নতুন দিক তুলে ধরা এবং পরামর্শ প্রদান করাও বর্তমান সমীক্ষার এক প্রধান লক্ষ্য।

প্রসব-পূর্ব সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের যে সব সেবা দেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: উচ্চতা, ওজন ও রক্তচাপের পরিমাপ সংরক্ষণ; উদর পরীক্ষা; রক্তস্বল্পতা, ইডিমা ও জনডিস পরীক্ষা; অ্যালবুমিন ও সুগারের মাত্রা নিরূপণের জন্য মূত্র পরীক্ষা; স্তন পরীক্ষা (প্রয়োজন হলে); স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা; আয়রন ও ফলিক এসিত টেবলেট সরবরাহ; ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বুঝতে পেরে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

---

[১৮] "Competence of the programme organizers in ante-natal care: An issue of the quality of care" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (এপ্রিল ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যাদ কাদির।

মোটামুটি এই আটটি সেবা দান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বগুড়া অঞ্চলের তিনটি থানার ৩৩ জন কর্মসূচি সংগঠকদের মধ্যে। কর্মসূচি সংগঠকদের যোগ্যতা যাচাই করার জন্য এক ধরনের বিশেষ্ণের মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছিল। যোগ্যতাকে ভাগ করা হয়েছে দু'ভাগঃ পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কর্মসূচি সংগঠক সকল গর্ভবতী মহিলার উচ্চতা ও শতকরা ৮০ জনের ওজন পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষা করেছেন। এছাড়া রক্তচাপ (৪৯%), জরায়ুর উচ্চতা (২০%), রক্তস্বল্পতা (১৯%) ও ইডিমা (৮%) পর্যাপ্তভাবে করা হয়েছে। মাত্র ৭% মহিলাকে রক্তক্ষরণ ও ১১% মহিলাকে মূত্রনালী সংক্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। গর্ভবতী কার্ডে যেসব মহিলাকে গর্ভজটিলতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া হয়নি (একমাত্র উচ্চতা <১৪৫ সে.মি. ছাড়া)। এক্ষেত্রে কর্মসূচি সংগঠক ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল। তাদের তত্ত্বাবধানেই সংগঠকেরা কাজ করেছেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এছাড়া তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কতখানি মানসম্মত ছিল তা খতিয়ে দেখা দরকার।

এই আলোকে বলা চলে কর্মসূচি সংগঠকদের জন্য প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কর্মসূচির সাফল্য এর উপরই বেশি নির্ভর করে। দেশে মা ও শিশুর মৃত্যু হার রোধে তখন হয়তো আমরা পাবো সবচেয়ে কার্যকর এক কর্মসূচি।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ একটি সমীক্ষা গ্রামের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর ধারণা[১৯]

হাশিমা-ই-নাসরীন, মোশ্‌তাক চৌধুরী, আব্বাস ভুইঞা, মাসুদ রানা এবং ইন্দ্রানী পেরিস-কাডওয়াল

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় সকল গ্রামের মতোই দু'টি গ্রাম – নারায়ণপুর ও সরদারকান্দি। চাঁদপুর জেলার মতলব থানার এই গ্রাম দু'টিকে তাই তেমন ব্যতিক্রম বলা যাবে না। জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ যথারীতি দরিদ্র। পুরুষদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ, আর প্রায় সকল মহিলাই গৃহিণী। আর কৃষিকাজ জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হলেও শতকরা ৩০ ভাগ পরিবার ভূমিহীন; অন্য কৃষিজীবীদের মধ্যেও দু'একর জমির মালিক আছেন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। শিক্ষার আলোও তেমন ছড়াতে পারেনি এই গ্রামাঞ্চলে্ শতকরা ৪৫ জন পুরুষ আর শতকরা ৭৩ জন মহিলা কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি। ফলে অনুন্নয়নের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ওঠার সংগ্রামে নারায়নপুর ও সরদারকান্দি নামের এ গ্রাম দু'টি তেমন জোরালো হয়ে উঠতে পারেনি এখনও। ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক প্রকল্পের অধীনে সম্প্রতি এ গ্রাম দু'টিতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধ্যান-ধারণা কী বা কতটুকু তা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। এ অনুসন্ধানে যে সব তথ্য মিলেছে তা রীতিমতো ভাবনার বিষয় হতে পারে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবারকে ছোট রাখতে হবে – এ ধারণা প্রচার পেলেও নারায়নপুর বা সরদারকান্দি গ্রামে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি দম্পতির (৩৯.৬%) রয়েছে তিন-চারজন সন্তান। অবশ্য এরপরই রয়েছে এক-দু'জন সন্তানের মাতা-পিতার সংখ্যা (৩২.৮%)। তবে এ কথাও ঠিক, পাঁচ-ছ'জন বা ছ'জনের বেশি সন্তান বিশিষ্ট পরিবারও রয়েছে উলে্লখযোগ্য সংখ্যক (১৮.৪%)।

গবেষণার জন্য নারায়নপুর ও সরদারকান্দি গ্রাম দু'টি বেছে নেয়ার নেপথ্যে রয়েছে একটি তুলনামূলক বিশে্লষণে পৌঁছার লক্ষ্য। একটি গ্রাম আইসিডিডিআর,বি-র কর্মসূচির অন্তর্গত (এমসিএইচ-এফপি), অন্য গ্রামটি সরকারি কর্মসূচির অন্তর্গত (কম্পোরিজন এলাকা)। দু'টি গ্রাম থেকে সন্তান জন্মদান সক্ষম ১৫-৪৯ বছর বয়সের মোট ৬০০ জন বিবাহিতা মহিলাকে বেছে নেয়া হয়েছে এ সমীক্ষার উদ্দেশ্যে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এমসিএইচ-এফপি এলাকার বেশিরভাগ মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের কমপক্ষে পাঁচটি আধুনিক পদ্ধতি (বড়ি, ইনজেকশন, কপার-টি, লাইগেশন ও কনডম) সম্পর্কে জানেন; অন্যদিকে কম্পারিজন এলাকার বেশিরভাগ মহিলা বলতে পেরেছেন মাত্র তিনটি পদ্ধতি (বড়ি, ইনজেকশন ও কনডম) সম্পর্কে। কিন্তু পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে জানলেই যে এর ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাবে – এমনটি এই সমীক্ষায় কিন্তু পরিলক্ষিত হয়নি। এমসিএইচ-এফপি এলাকার অর্ধেকের কিছু বেশি সংখ্যক এবং কম্পারিজন এলাকার এক-তৃতীয়াংশ মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এমসিএইচ-এফপি এলাকার মহিলারা প্রাধান্য দেন ইনজেকশন ও বড়িকে। কপার-টি ব্যবহারকে এঁদের বেশিরভাগ মনে

[19] "An assessment of clients' knowledge of family planning in Matlab" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যাদ কাদির।

করেন স্বাস্থ্যের জন্য আশঙ্কাজনক। কম্পারিজন এলাকার মহিলারা কপার-টি ব্যবহার করেন না স্বামীর নিষেধ, লজ্জা এবং মিলনকালীন জ্বালাপোড়া অনুভূতির কারণে। উভয় এলাকার মহিলাদেরই লাইগেশনের ব্যাপারেও রয়েছে স্বামীর নিষেধ, অস্ত্রোপচারের ভয় এবং আরও সন্তানের আকাঙ্খা। তবে লাইগেশন যে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা তা এঁরা সবাই জানেন।

সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে মহিলাদের মধ্যে বড়ির প্রচলন বেশি থাকলেও এই বড়ি নিয়ে নানা রকম ভুল ধারণাও রয়েছে। এমসিএইচ-এফপি এলাকার বেশিরভাগ মহিলা মনে করেন বড়ি হলো নববিবাহিতাদের জন্য; অন্যদিকে কম্পারিজন এলাকার বেশিরভাগ মহিলার ধারণা ৩৫ বছরে কম বয়সী মহিলাদের জন্য বড়ি উপযোগী। এছাড়া প্রায় সকল মহিলাই মনে করেন যে ইনজেকশন পদ্ধতি কমপক্ষে এক সন্তানের মা অথবা ৩৫ বছরের কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কম্পারিজন এলাকার বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা এমন কথাও বলেছেন যে, কনডম ব্যবহার করতে হয় মহিলাদেরকে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এমসিএইচ-এফপি এলাকার বেশিরভাবগ মহিলা বড়ি, ইনজেকশন ও কনডম ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে মোটামুটি জানেন। কিন্তু কম্পারিজন এলাকার মহিলারা এ সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ বলা চলে। যেমন, বড়ি খেতে ভুলে গেলে কিংবা বড়ির পাতায় যে সাতটি আয়রণ ট্যাবলেট আছে সেগুলো কী করতে হবে তা তাঁরা জানেন না। ইনজেকশন, কনডম ও কপার-টি এই তিনটি পদ্ধতির ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও দু'টি এলাকায় তুলনামূলক অবস্থান একই রকম বলা চলে।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের সুফল, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নারায়নপুর ও সরদারকান্দি গ্রামের বেশিরভাগ মহিলা প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করেন। বড়ি ও ইনজেকশনের ফলে মাথা ঘোরে, মাথাব্যথা হয়, শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়, মাসিক অনিয়মিত হয়, মাসিকের সঙ্গে বেশি-বেশি রক্ত যায়, প্রভৃতি ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল। কনডম সম্পর্কেও নানা রকম ধারণা রয়েছে মহিলাদের মধ্যে। অনেকে মনে করেন, কনডম ব্যবহারের ফলে জননতন্ত্রে ঘা হয় এমনকি এটা মহিলাদের পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। আর লাইগেশন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর – এ ধারণা এত ব্যাপক যে এ প্রসঙ্গে আর বেশি কিছু বলার সুযোগ মেলে না।

এ গবেষণা থেকে সহজেই বোঝা যায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সবিস্তার ধারণা খুব অল্প মহিলাই রাখেন। কাজেই গোটা পদ্ধতি সম্পর্কেই পূর্ণাঙ্গ তথ্য মহিলাদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা নিজেরাই বেছে নিতে পারেন তাঁদের উপযুক্ত পদ্ধতিটি।

যে অনুন্নয়ন গ্রামীণ দারিদ্রকে আঁকড়ে ধরে আছে তার মাত্র একটি চিত্র ফুটে উঠেছে নারায়নপুর ও সরদারকান্দি গ্রামে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিচালিত এই সমীক্ষায়। এ সমীক্ষা প্রমাণ করেছে পরিবার পরিকল্পনা সেবার গুণগত মানের উন্নতি সাধনের জন্য যথাযথ তথ্য সরবরাহ, শিক্ষা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের কর্মসূচি গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। না হলে ষাটের দশক থেকে চালু হওয়া একটি কর্মসূচি এতগুলো বছরে কি অর্জন করল তা হয়তো প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে।

গ্রামীণ এলাকায় প্রসব পরবর্তী সময়ে জন্মনিরোধক ব্যবহারের ধরন[২০]

রুখসানা গাজী, ফজলুল করিম, এ এম আর চৌধুরী ও শাহ নূর মাহমুদ

পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিগত বছরগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য পাওয়া গেলেও এখনও এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট বেশি। অপরিকল্পিত সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে এদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা অনেকাংশে দায়ী। এদেশের নগণ্য সংখ্যক মানুষ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তাছাড়া মাথা পিছু আয় অত্যন্ত কম। আবার, আমাদের সমাজে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের কদর বেশি কারণ পুত্র সন্তানকে সামাজিক ও আর্থিক গ্যারান্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সবকিছুই জন্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায়, মা সন্তান প্রসবের পর প্রত্যাশিত সময়ের আগেই আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন। প্রসবের পর ঘর ঘন গর্ভধারণ মায়ের জীবনের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানদের মাতৃদুগ্ধ পান করালে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অথচ, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা যায়, সন্ত নাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। তাই ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রামীণ মায়েদের বিভিন্ন জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছে, বিশেষতঃ প্রসব পরবর্তীতে গর্ভবতী হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলার জন্য – অর্থাৎ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। নিয়মিত স্তন্যদান পরিকল্পিত সময়ের ব্যবধানে গর্ভবতী হতে সাহায্য করে।

প্রসবের পরে জন্মশীলতা সম্পর্কে মায়েদের জ্ঞান কতটুকু এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান ও জন্মবিরতিকরণের ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এ সমীক্ষা পরিচালানার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ সমীক্ষাটি বগুড়ার কর্মসূচি এলাকায় ও জয়পুরহাটের কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় পরিচালনা করা হয়। কর্মসূচি এলাকার ২০০ জন মহিলা ও কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার ২০০ জন মহিলাকে বাছাই করা হয় তথ্য সংগ্রহের জন।

মায়েদের অবস্থা

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ৬২% মহিলা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় ৫৪.৫% মহিলা লক্ষীভূত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সমীক্ষার জন্য বাছাইকৃতদের অধিকাংশই ২১-৩০ বছর বয়স্ক। এদের খানা প্রধানদের অধিকাংশই দিনমজুর। কর্মসূচিভুক্ত এলাকার ৩০% মা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার ২০% মা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। কর্মসূচিভুক্ত এলাকার ১৯% মা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার ১৬.৫% মা হাই স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। প্রায় অর্ধেক মহিলাদের স্বামীরাই অশিক্ষিত। শতকরা ১০ ভাগ মহিলার মৃত শিশু জন্মদানের ইতিহাস আছে।

---

[20] "Post-partum reproductive behaviour regarding contraception and breast-feeding in rural Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছন এ কে এম আহসান উলল্লাহ।

প্রায় ৯৩% মহিলাই তাদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ান। আর যারা খাওয়ান না তাদের ৯০% বলেছেন, শিশুরা দুর্বল বিধায় দুধ চুষতে পারে না। দেখা যায়, কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ৯১% মায়েরা শিশুদের শালদুধ খাওয়ান আর এ হার কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় মাত্র ৭১%। কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ৬৬% মা আগেভাগে পরিপূরক খাবার দেয়া শুরু করেছেন, অন্যদিকে কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় এ হার মাত্র ৩৯%। পরিপূরক খাবার হিসেবে দেয়া হয় শর্করা জাতীয় খাদ্য, গরুর দুধ, চিনি, ভাতের মাড় ও কলা। অধিকাংশ প্রসূতি মায়েরা সন্তান প্রসবের ৩১-৪০ দিনের মধ্যে পুনরায় সহবাস শুরু করে। এদের মধ্যে কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ২৫% মহিলা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় ৩৪% মহিলা সন্তান প্রসবের এক মাসের মধ্যেই সহবাস শুরু করে।

কর্মসূচিভুক্ত এলাকার ২৭ জন জন্মবিরতিকরণ ব্যবস্থা গ্রহণকারীর মধ্যে ১০ জন খাবার বড়ি খান, ১১ জন কনডম ব্যবহার করেন, ৪ জন ইনজেকশন ও দুইজন নিয়েছেন ভেষজ বড়ি। আবার কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার ১২ জন জন্মবিরতিকরণ ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৫ জন খাবার বড়ি ও ৭ জন কনডম ব্যবহার করেন। দেখা যায়, কর্মসূচি এলাকার ৬৫% মহিলা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার ৭৪.৫% মহিলা বিশ্বাস করেন যে সন্তান প্রসবের পরবর্তী সময়ে মাসিক না হওয়া পর্যন্ত তারা আবার জন্মশীলতা ফিরে পান না।

উপসংহার

যদিও কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার মায়েদের তুলনায় কর্মসূচিভুক্ত এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেশি মায়েরা তাদের শিশুদের শালদুধ খাওয়ান, তাদের অধিকাংশই শিশুদেরকে বুকের দুধ সঠিকভাবে খাওয়ান না। দেখা গেছে চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই মায়েরা শিশুকে পরিপূরক খাবার দিতে শুরু করে। তাই, মায়েদেরকে পরিপূরক খাবার শুরু করার সঠিক সময় সম্পর্কে শিখাতে হবে। অন্যদিকে মায়েদের ধারণা প্রসবের পরে মাসিক শুরু না হওয়া পর্যন্ত জন্মশীলতা ফিরে আসে না, তাই তারা মাসিক না হলে কোনো রকম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। শিশুকে বুকের দুধ পান করালে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে তবে এ পদ্ধতিটি সব সময় কার্যকর হয় না। কারণ মায়েরা অনিয়মিতভাবে বুকের দুধ খাওয়ান। তাই মায়েদেরকে প্রসব পরবর্তী সময়ে সহবাস শুরু করার সময় থেকেই (মাসিক শুরু হোক বা না হোক) প্রসূতিদের উপযোগী জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ঃ একটি পর্যালোচনা[২১]

আহমেদ আলী ও শাহ নূর মাহমুদ

বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর এ পর্যন্ত খুব কমই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। শৈশব থেকে বয়োঃপ্রাপ্তির এ সন্ধিক্ষণ জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। আর এ সময়টাকে কৈশোর বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০-২০ বছরের মধ্যের এ সময়টাকে কৈশোর বলে অভিহিত করেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২২ জনই কিশোর-কিশোরী। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ। কারণ এ বয়সের স্বাস্থ্যের একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। এ বয়সে কতিপয় বিষয় লক্ষ্যণীয় যেমন, এ বয়সে শারীরিকি পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা যায়। শরীরে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আচরণ এবং অবস্থানে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

সাধারণত: ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই কিশোরীদের শারীকির বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সময়ে তাদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। মহিলাদের গর্ভকালীন সময়েও বেশি বেশি পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অনেকের মতে, কিশোরীদের পুষ্টি গ্রহণ নির্ভর করে তাদের কাজের চাপ কতটুকু তার উপর। দেখা গেছে, ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়ুয়া কিংবা যারা কখনও স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে অনেক বেশি।

বাল্য বিবাহ কিশোরীদের স্বাস্থ্য অবনতির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে ১৮ বছরে কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেয়া আইনত দণ্ডনীয়, অথচ দেখা যায় এ দেশে ১৪ বছর বয়স্ক কিশোরীদের শতকরা ২৫ জনেরই বিয়ে হয়ে যায়। অবশ্য নেপালে এ হার আরো বেশি (৩৪%)। শহর এলাকার চেয়ে পল্লী এলাকায় বাল্য বিবাহের হার বেশি। এ সকল এলাকায় কিশোরীদের এক বার মাসিক হয়ে গেলেই তাদের বিয়ের বয়স হয়েছে বলে ধরা হয়। এ সময়ে তারা পেটের ব্যথা ও মূত্রতন্ত্রের জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোরীদের (১১%) মাসিক শুরুর পূর্বেই বিয়ে হয়ে যায়। এর হার হিন্দু সম্প্রদায়ে বেশি লক্ষণীয়। দেখা গেছে, অশিক্ষিতদের চেয়ে যে সকল কিশোরীরা পড়ালেখা করেছে তাদের বিয়ে দেরিতে হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মেয়েদেরই (৫৭%) মতামতের কোন মূল্য দেয়া হয়না। আবার দেখা যায়, পোষাক শিল্পের প্রসার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রসারের জন্য কিশোরীরা বিভিন্ন শ্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১৯ বছরের কম বয়সের কিশোরীদের প্রতি হাজারে গর্ভকালীন মৃত্যু ৫.৪ জন, কিন্তু ২০-২৪ বছর বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ হার অনেক কম (২.৭ জন)। এ দেশে একটি

[21] "The health situation of adolescents: a literature review" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ।

ধারণা চালু আছে যে, বিবাহের পরপরই জন্ম নিরোধক ব্যবহার করলে পরবর্তীতে সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে যাবে। সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে জন্মনিরোধক ব্যবহার হার ১৯৮৫ সকালের তুলনায় (১২%) ১৯৯৩-এ দ্বিগুণের দাঁড়িয়েছে (২২%)।

সামাজিক ও পারিবারিক চাপ এবং পরিবার পরিক?ল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় আমাদের দেশের বিবাহিত কিশোরীরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিশোরী বয়সে গর্ভবতী হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রতি হাজারে কিশোরী গর্ভবতীর হার ২৪০-২৭৪ কিন্তু ইউরোপে এ হার মাত্র ৭০ এবং আফ্রিকায় ১৩০। এ দেশে শতকরা ৫০ ভাগ মহিলাই বিবাহের দুই বছরের মধ্যেই গর্ববতী হয়ে পড়ে। কিশোরীরা গর্ভধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতায় ভোগে এর মধ্যে রক্তশূন্যতা, রক্তদূষণ, গর্ভপাত, প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ, ইনফেকশন ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি, ইত্যাদি অন্যতম।

কিশোরীদের গর্ভজাত সন্তান সব সময়ই কম ওজনের হয়ে থাকে। স্বল্প ওজনের সন্তান সাধারণত: প্রসবকালীন সময়ে কিংবা জন্মের পরপরই মারা যায়। এ সময়ে কিশোরীরা স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। দেখা যায়, কিশোরীদের গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যু তার ২০-৩০ বছর বয়স্ক মহিলাদের শিশু মৃত্যু হারের দ্বিগুণ। যে সকল মায়েদের বয়স ২০ বছরের কম তাদের শিশুদের পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ২০-৩৪ বছর বয়সের মায়েদের শিশুদের তুলনায় বেশি। এ হার ১৮ বছরের কম বয়সের মায়েদের শিশুর ক্ষেত্রে ৪৬% এবং ১৮-১৯ বছর বয়সের মায়েদের শিশুর ক্ষেত্রে ১৩%।

বিশ্বে প্রতি ৪ জনে ১ জন ২১ বছর বয়েসের মধ্যেই যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এইচআইভি আক্রান্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেখা গেছে, বিশ্বে ১৫-১৯ বছর বয়স্কদের ২৩% বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করছে। সাধারণত: কিশোর বয়সে মদ, ধূমপান ইত্যাদি অভ্যাস হয়ে থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মানিকগঞ্জের শতকরা ১০ জন কিশোর ধুমপান করে থাকে তবে কিশোরীদের মধ্যে এ হার শূন্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উপর আরো ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই কিশোর-কিশোরী।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব[22]

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

বাংলাদেশের মতো অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে রক্তস্বল্পতা একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। এতে শিশু-কিশোর, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মায়েরা অধিক হারে আক্রান্ত হন। যে সকল উল্লেখযোগ্য বিষয় এই সমস্যার সাথে জড়িত তার মধ্যে নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অশিক্ষা এবং দারিদ্র উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারা বিশ্বের ৭০ কোটি লোক রক্তস্বল্পতার শিকার যার অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী। উন্নয়নশীল দেশে ৩৬ শতাংশ নাগরিক রক্তস্বল্পতার শিকার অথচ উন্নত বিশ্বে এর হার মাত্র ৮ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলো মধ্যে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব বিষয়ে অত্যন্ত সীমিত গবেষণা হয়েছে। পুষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও গবেষণা ভিত্তিক তথ্যের অভাবে জাতীয় পর্যায়ে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সুইডেনের উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজী ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের সহযোগিতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রক্তস্বল্পতার উপর একটি পাইলট জরিপ চালানো হয়। এই জরিপের মাধ্যম রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব, রক্তস্বল্পতার সম্ভাব্য কারণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনস্বাস্থ্য, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে দেখা হয়।

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ময়মনসিংহ জেলার ১২টি গ্রামে এ গবেষণা চালানো হয়। এ সমীক্ষার জন্য ১৮ থেকে ৪৯ বৎসর বয়স্ক ৮৪ জন পুরুষ, ১৮৪ জন মহিলা এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক ১২ জন বালক ও ৪৪ বালিকাকে নির্বাচন করা হয়। এদের রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, প্যারাসাইটের আক্রমণ, শিক্ষার মান এবং পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কি তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

দেখা গেছে, পুরুষের ক্ষেত্রে গড় হিমোগ্লোবিন ১১৮ গ্রাম/লি. এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ১১২ গ্রাম/লি। পুরুষদের মধ্যে ২০-৩০ বছর বয়সীদের মাঝে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি (৮৫ শতাংশ), অথচ ৩০-৪৮ বছর বয়সীদে মধ্যে এ হার তুলনামূলকভাবে কম (৬৪ শতাংশ)। অন্যদিকে মহিলাদের মধ্যে ৩০-৪৮ বৎসর বয়স সীমার মধ্যে এ হার ৭৬ শতাংশ কিন্তু ১৫-২০ বছর বয়সীদের মধ্যে এ হার ৫৬ শতাংশ।

[22] "Prevalence of anaemia among men and women in rural Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (আগস্ট ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান।

হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ও রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের হার অর্থনৈতিক অবস্থায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে নাই। কিন্তু শিক্ষা অর্জনের উপর হিমোগ্লোবিনের হারের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। দেখা গেছে, নিরক্ষর পুরুষদের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সর্বোচ্চ (১২৩ গ্রাম/লি.) এবং প্রাথমিক বা তদূর্ধ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে এ মাত্রা কম (১১৩ গ্রাম/লি.)। অন্যদিকে নিরক্ষর মহিলাদর মধ্যে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সবচেয়ে কম (১০৪ গ্রাম/লি.); কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে এর মাত্রা বেশি। মহিলাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের হার নিরক্ষতার ৭৪ শতাংশ এবং প্রাথমিক বা তদুর্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত ৭২ শতাংশ; অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে এ হার যথাক্রমে ৬১ শতাংশ ও ৬৪ শতাংশ।

রক্ত হিমোগ্লোবিনের হারের উপর জমির মালিকানার কোন প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার প্রায় একই থাকলেও কম জমির অধিকারী মহিলাদর ক্ষেত্রে এ হার কম। দেহে জীবাণুর সংক্রমেণর সাথে রক্তে হিমোগ্লোবিনের হারের যথেষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়। কৃমি আক্রান্ত পুরুষদের হিমোগ্লোবিনের হার ১১০ গ্রাম/লি. অর্থাৎ রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের হার ৮৬ শতাংশ। অন্যদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ হার ১০৯ গ্রাম/লি. অর্থাৎ রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের হার ৭৮ শতাংশ। অথচ সংক্রমণ নেই এমন পুরুষের ক্ষেত্রে এ হার ১১৯ গ্রাম/লি. (রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের হার ৬৩%) এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১১৪ গ্রাম/লি. (প্রাদুর্ভাবের হার ৬৫%)।

হিমোগ্লোবিনের হার হ্রাস-বৃদ্ধিতে শিক্ষা, জমির মালিকানা, অর্থনৈতিক অবস্থার, বয়স ও লিঙ্গভেদে কোন প্রভাব আছে কি না তা' পরীক্ষার লক্ষ্যে এক হিসাবে দেখা গেছে লিঙ্গভেদে এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থা মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মহিলারা প্রাথমিক বা তদুর্ধ মাত্রায় শিক্ষিত মহিলাদের তুলনায় ৬৪ গুণ রক্তস্বল্পতার শিকার হন। অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি।

এ গবেষণার গ্রামের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার জনগোষ্ঠী থেকে পর্যাপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। কেবল ১২টি গ্রাম থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বলে সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়নি। গর্ভবতী মহিলা, ১১ বৎসরের কম ও ৪৮ বৎসরের বেশি মেয়েকে এ গবেষণা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে তাই এ গবেষণা অসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে। গবেষণায় রক্তস্বল্পতার কারণ হিসাবে কেবল একটি মাত্র ধাপ হিমোগ্লোবিনের ঘনত্বকে ধরা হয়েছে। ফলে অপুষ্টি, প্যারাসাইট আক্রমণের রক্তস্বল্পতার অবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা এ গবেষণায় স্থান পায়নি। বাংলাদেশের পল্লী এলাকার পুরুষেরা দিনের বেলায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করার কারণে এ গবেষণায় মেয়েদের অধিক সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা যায়, পল্লী এলাকার পুরুষ ও মহিলা সমানভাবে রক্তস্বল্পতার শিকার। বর্তমানকালে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমে কেবল গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলাদের রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আয়রন-ফলিক এসিড সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পুরুষের উচ্চ রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার দাবী রাখে এবং কেবল গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের মধ্যে এই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না রেখে সকল বয়সের জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

পুষ্টি উন্নয়নে পরিপূরক খাবার ঃ মুক্তাগাছা পাইলট প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন[২৩]

মাসুমা খাতুন ও এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানাভাবে নানা রকম উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে অপুষ্টির ভয়াবহতাকে একেবারে রোধ করা না গেলেও অন্তত: হ্রাস করা যায়। এমনই একটি উদ্যোগ নেয় ব্র্যাক। ১৯৯৩ সাল থেকে ময়মনিসংহ জেলার মুক্তাগাছ। থানার তিনটি এলাকার ১৫৮টি গ্রামে দু'টি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল নারী, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টিমানের উন্নতি ঘটানো। এজন্য পুষ্টিকর পরিপূরক খাদ্য বিতরণের পাশাপাশি উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় পরিপূরক খাদ্যকে।

মুক্তাগাছার এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ফলে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও চিন্তা-চেতনায় কী কী পরিবর্তন এসেছে তা যাচাই করে দেখার জন্য ব্র্যাক-এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। এ সমীক্ষার পূর্বে প্রকল্পের কিছু বিষয় মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় যেমন, পুষ্টিগত মান, পরিপূরক খাবারের মূল্য ও তা গ্রহণের পরিমাণ ইত্যাদি। যে তিনটি এলাকায় প্রকল্পের কাজ চলছে সেখানেই গবেষণাটি করা হয়। এলাকা তিনটি হলো: পাড়াটুঙ্গী, চেচুয়া ও গাবতলী। ব্র্যাক-এর তিনটি প্রধান কর্মসূচির কাজ চলছে মুক্তাগাছা এলাকায়। কর্মসূচি তিনটি হলোঃ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি), উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আরএইচডিসি)।

পরিপূরক খাবার প্রস্তুত করা হয় 'মোয়া'র' আকারে, পরিবেশন করা হয় প্যাকেটে। মাদেরকে তাদের বাড়িতে গিয়ে এবং বাচ্চাদেরকে ফিডিং সেন্টারে এই খাদ্য বিতরণ করা হয়, মায়েদের জন্য ১৭৫ গ্রামের প্যাকেট, শিশুদের জন্য ৫০ গ্রামের প্যাকেট। মায়েদের প্যাকেটে থাকে ভাজা বাদাম, ভাজা চাল ও গুড়; দু'বছরের কমবয়সী শিশুদের প্যাকেটে থাকে ভাজা চালের গুঁড়ো, ভাজা ডালের গুঁড়ো, গুড় ও এক চা চামচ সয়াবিন তেল। এই সব উপকরণ এলাকায় সারা বছরই পাওয়া যায় এবং দামেও তেমন পরিবর্তন হয় না। সরবরাহকৃত পরিপূরক খাবারের সবটুকু যদি খায় তবে একজন মা ৭৫২ কিলোক্যালরীর সমপরিমাণ শক্তি পাবে এবং একজন শিশু ২১২ কিলোক্যালরী শক্তি পাবে।

সমীক্ষার জন্য তিনটি এলাকা থেকে নিম্নলিখিত নমুনা নেয়া হয়: (১) ১২ প্যাকেট পরিপূরক খাদ্য; প্রতি এলাকা থেকে চার প্যাকেট (দু'প্যাকেট মায়ের ও দু'প্যাকেট শিশুর জন্য); (২) ১৫ জন (প্রতি এলাকা থেকে পাঁচ জন) অন্তঃসত্ত্ব বা স্তন্যদানকারী মা এবং তাঁদের পরিবারের মুরব্বি; (৩) তিন গ্রুপ (প্রতি এলাকা থেকে এক গ্রুপ) গ্রাম কমিটির সদস্য (ছ' থেকে আট জনকে নিয়ে একটি গ্রুপ); এবং (৪) ছ'টি ফিডিং সেন্টার এবং ছ'টি খাবার প্রস্তুতের স্থান (প্রতি এলাকা থেকে দু'টি করে)। ১৯৯৬ এর ২রা

---

[23] "Assessment of supplementary food in Muktagachha pilot nutrition initiative of BRAC" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুন ১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায্যাদ কাদির।

ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে পরিপূরক খাদ্য পরীক্ষা করা হয়।

সমীক্ষার দেখা যায়, মায়েরা পরিপূরক খাবারের ৭৫% খায়, যা তাকে ৫৬৪ কিলোক্যালরীর সমান শক্তি যোগায় অর্থাৎ তাদের প্রাত্যহিক সুপারিশকৃত প্রয়োজনের ২২-৪৪ ভাগ কম। এর কারণ মায়েরা পরিপূরক খাবার প্রায়ই ভাগ করে খায়। মাঝে-মধ্যে স্বামী কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও ভাগ করে খায়। এছাড়া পরিপূরক খাবার সকালের নাস্তার আগে বিতরণ করা হলে তারা আর নাশতা খায় না। পরিপূরক খাদ্যের স্বাদ, মা ও শিশু উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। শিশুরা সাধারণত: তাদের পুরো খাবারটা ফিডিং সেন্টারেই খেয়ে নেয়। যদি খুব অসুস্থ হয়, কোনও শিশু পুরো খাবার খেতে পারেনা বাকিটুকু মায়েরা বাড়িতে নিয়ে যায়। যেসব ফিডিং সেন্টারে স্থান সংকুলান হয় না কিংবা পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর সেখানে দেখা গেছে যে শিশুদের খাবারের সবটুকু মায়েরা বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়া খাবার সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না।

পরিপূরক খাবারের দাম হিসাব করে দেখা যায়, মায়েদের খাবারের দাম প্যাকেট প্রতি পাঁচ টাকা এবং শিশুদের খাবারের দাম প্যাকেট প্রতি দু'টাকা ১৩ পয়সা পড়ে। মজুরি হিসাব করলে প্যাকেট প্রতি খাবারের দাম এক টাকা থেকে দু'টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত বেড়ে যায়। মজুরির ব্যাপারে গ্রাম কমিটির সদস্যরা সন্তুষ্ট নয়। তারা মনে করে, মেহনত অনুযায়ী মজুরি মিলছে না।

পরিচালিত সমীক্ষার ফলে যে তথ্য পাওয়া গেল তাতে বলা যায়, পুষ্টি প্রকল্পটি ভালভাবে চলছে, বিশেষ করে খাবারের গ্রহণযোগ্যতা, স্বাদ এবং উপকরণগুলির প্রাপ্যতা ছিল সন্তোষজনক। তবুও কিছু কিছু দিক আছে যা নতুন পরিকল্পনা দ্বারা পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

পরিপূরক খাবার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা ঃ মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের একটি পাইলট সমীক্ষা[২৪]

মাসুমা খাতুন ও এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

মা ও শিশুদের পুষ্টিমানের উন্নতির জন্য ব্র্যাক ১৯৯৩ থেকে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার তিনটি এলাকার ১৫৮টি গ্রামে একটি পাইলট পুষ্টি প্রকল্প চালু করে। এলাকা তিনটি হল, পাড়াটুঙ্গী, চেচুয়া ও গাবতলী। গ্রামবাসী ও সুবিধাভোগী মহিলা, কিশোর-কিশোরী ও দুই বছর বয়সের নীচের ছেলে-মেয়েদেরকে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করে তাদের পুষ্টিগত মান উন্নয়নই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিবন্ধনকৃত গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা ও তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের পরিপূরক খাদ্য সম্পর্কে ধারণা জানা। পরিপূরক খাদ্য দেয়া হচ্ছে এমন শিশুদের মা ও গ্রাম কমিটির সদস্যদেরও পরিপূরক খাদ্য সম্পর্কে কী ধারণা তা জানা। এ সমীক্ষার জন্য সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

মা, স্বামী ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল গর্ভবতী মা ও শিশুদেরকে কেন পরিপূরক খাবার দেয়া হয় এবং এটা তাদের কাছে কেমন লাগে। যে উত্তরগুলো খুব সহজে পাওয়া গিয়েছে তা হল – মা ও শিশুদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই তাদের পরিপূরক খাবার প্রয়োজন। গর্ভকালীন ও স্তন্যদানের সময়ে মায়েদের বিশেষ যত্ন ও অতিরিক্ত খাবার প্রয়োজন। এটা শিশু ও মা উভয়ের স্বার্থেই করা প্রয়োজন। গর্ভবতী মাকে যথেষ্ট খাদ্য দেয়া না হলে তিনি রুগ্ন শিশু জন্ম দিবেন। কম ওজনের মা ও শিশু প্রায়শঃই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাছাড়া শিশুর পর্যাপ্ত বিকাশের জন্যও পরিপূরক খাবার প্রয়োজন।

গর্ভকালীন সময়ে মায়েদেরকে অতিরিক্ত খাবার দিলে স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম নেয়। শিশুর বিকাশও স্বাভাবিক থাকে। ৭৬ বছর বয়স্ক এক শাশুড়ী বলেন যে, তাদের আমলে প্রচুর তাজা ও বিশুদ্ধ খাবার পাওয়া যেত। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ও অর্থাভাবে প্রতিদিন তিন বেলা খাদ্য গ্রহণই কষ্টকর। এজন্য মা ও শিশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে ব্র্যাক মোয়া আকারে যে পরিপূরক খাদ্য দিয়ে থাকে তা খুবই ভাল। একজন স্বামীর মতামত হল যে, তিনি জানতেনই না যে গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের অতিরিক্ত খাবার দেয়া উচিত। তিনি এ বিষয়ে ব্র্যাকের কাছ থেকে জেনেছেন। দেখা গেছে, একজন শাশুড়ী ব্যতিরেকে প্রায় সকল মহিলা ও তাদের স্বামীরদের এই প্রকল্পের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে।

দুই বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েদেরকেও পরিপূরক খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা তাদের শিশুদেরকে পরিপূরক খাবার কেন দেয়। অধিকাংশ মা এ বিষয়ে যে মত দেন তা হল, শিশুদের অতিরিক্ত খাবার প্রয়োজন কারণ শিশুরা বয়স অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। খাবারগুলো ভাল, খাবারটা মজাদার এবং এতে পুষ্টি আছে। যে সকল শিশুরা এই প্রকল্পের অধীন ছিল তাদের মায়েরা একই খাদ্য নিজেরা তৈরি

[24] "Community perception on Muktagachha pilot nutrition initiative of BRAC" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ এক এম আহসান উলাহ্।

করেছে যেহেতু শিশুরা খেতে চেয়েছে এবং এটা বানানোর উপকরণাদিও সহজলভ্য। অনেক মা-ই জানিয়েছেন তারা পূর্বে পরিপূরক খাবার সম্পর্কে জানতেন না। শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের অতিরিক্ত খাবার কম প্রয়োজন জানতেন না। এরা তাদের অতিরিক্ত খাবার দিতেন না। ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত। কিন্তু ব্র্যাকের কর্মসূচি শুরু হওয়ার ফলে তারা এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

গ্রাম কমিটির সদস্যদেরকেও পরিপূরক খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচি থেকে তারা লাভবান হতে পেরেছে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। গ্রাম কমিটির অধিকাংশ সদস্য যে সকল মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল: যদিও তাদের কঠোর পরিশ্রম হয় এবং আর্থিক সুবিধাও খুবই সামান্য তবুও এ কাজ করে তারা আনন্দই পাচ্ছেন। পূর্বে যখন কিশোরীদের খাদ্য দিত তখন তাদের যথেষ্ট লাভ হতো কিন্তু ওটি বন্ধ হয়ে যায়। তারা আরো কাজ চায়। কাজ করে তারা সংসার চালানোর মত অর্থ আয় করতে চায়। তারা আর্থিকভাবে এতটা কমই লাভবান হচ্ছে যে তাদের স্বামীরাও তাদেরকে উপহাস করে। তারা দরিদ্র। টাকা পেলে তারা কঠোর শ্রম দিতেও রাজি। বর্তমানে ব্র্যাক কর্মসূচির জন্য গর্ভবতীদের সংখ্যাও কমে গেছে। লাভ না হওয়ার এটাও একটি কারণ।

এ কাজ করার জন্য তারা নিজেদের বাসার রান্না বান্নার কাজ করতে সময় দিতে পারে না। ফলে স্বামীরা তাদের উপর রেগে যায়। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পরিপূরক খাদ্য তৈরি ও বিতরণে যে খরচ হয় তাতে লোকসান হয়। পরিপূরক খাদ্য তৈরি ও বিতরণে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন, সময়ের স্বল্পতা, বেশি শ্রম ও সামান্য লাভ; তারপরেও তারা এ কাজটি উপভোগ করছেন। এর কারণ হল তারা মনে করেন যে, তাদের পরিশ্রম হলেও মা ও অপুষ্ট শিশুরা প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু খাবার পাচ্ছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ল্যাট্রিন বিক্রয় কতটুকু ফলদায়ক?[২৫]

সাধনা বিশ্বাস ও সৈয়দ মাসুদ আহমদ

উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে সমস্ত স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ সমস্যাই পানি বাহিত কারণে হয়ে থাকে। এ পানি বাহিত রোগগুলো থেকে বাঁচতে হলে সাংসারিক সমস্ত কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার। ব্র্যাক ১৯৯১ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সভা, গ্রাম কর্মী ১৯৯১ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সভা, গ্রাম কর্মী ও স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে বিশুদ্ধ পানি পান ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজ করছে। ১৯৯৫ এর জুন পর্যন্ত ব্র্যাক মতলবের বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে প্রায় ৪৫,০০০ স্লাব ল্যাট্রিন বিক্রি করেছে। এই ল্যাট্রিনগুলো ঠিকমত বসান ও ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং স্লাব ল্যাট্রিন রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জনগণ কতটুকু সচেতন তা দেখার জন্য এ সমীক্ষা চালানো হয়।

১৯৯২ সালের গোড়ার দিকে ব্র্যাক একজন রাজমিস্ত্রীকে স্লাব ল্যাট্রিন তৈরির জন্য ঋণ দেয়। পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় গ্রাম সংগঠনের ২/৩ জন সদস্যকে ল্যাট্রিন তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারা ল্যাট্রিন বানিয়ে বিক্রি শুরু করে। বাড়ি প্রতি একটি ল্যাট্রিন হিসাবে মতলবে জুলাই '৯৪ হতে অক্টোবর '৯৫ পর্যন্ত মোট ২৬২টি ল্যাট্রিন বিক্রি হয়েছে এর মধ্যে মাত্র ৬০% ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে এবং স্থাপিত ল্যাট্রিনের ১২% অব্যবহৃত রয়ে গেছে। অধিকাংশ ল্যাট্রিন (৯৩%) বিক্রি হয়েছে ঐ সমস্ত খানায় যারা ব্র্যাক কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা ব্র্যাক কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য তারা যত ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে তুলনামূলকভাবে যারা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য নয় তাদের মধ্যে এ হার বেশি।

অনেকেই (৬৬%) ল্যাট্রিনের মূল্য আংশিক পরিশোধ করে থাকে, বাকী টাকা পরিশোধ করে ল্যাট্রিন আর বাড়িতে আনেও না এবং স্থাপনও করে না। দেখা গেছে, যারা ল্যাট্রিন কিনেছে তাদের এক তৃতীয়াংশই নিজেদের অর্থে কিনেছে। শতকরা ১৭ জন কিনেছে ব্র্যাকের দেয়া ঋণে। বাকীরা সরকারি সহায়তা কিনেছে। ১৯৯৫ এর জুলাই মাসে একটি ল্যাট্রিনের দাম ছিল ৩৮৫ টাকা। সরকার তখন ল্যাট্রিন প্রতি ২০০ টাকা ছাড় ঘোষণা দিলে এর মূল্য দাঁড়ায় ১৮৫ টাকা। মূলতঃ অধিকাংশ ল্যাট্রিন (৬৯%) তখনই বিক্রি হয়।

অনেকে ল্যাট্রিন স্থাপন করেও তা ব্যবহার করে না। ব্র্যাক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয় এমন প্রায় প্রত্যেক খানাই ল্যাট্রিন ব্যবহার করে কিন্তু যারা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য তাদের একটি বিরাট অংশ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। দেখা গেছে, ব্র্যাকের মতলব এরিয়া অফিস থেকে ল্যাট্রিন কিনে অনেকেই বসাননি। এ ক্ষেত্রে শতকরা ৪৯ জন জানিয়েছেন ল্যাট্রিনের উপর ঘর তুলতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। শতকরা ৩৭ জন সরকারি ছাড় পায়নি বলে ল্যাট্রিন কিনেও বসায়নি। কিছু

[25] "Salling latrines to the poor: how effective it is?" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শারমিন রহমান।

সংখ্যা উত্তর দাতা (১৪%) জানিয়েছে তাদের বাড়ি বন্যায় প্লাবিত হওয়র কারণে তারা ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারেনি। ল্যাট্রিন ব্যবহার না করার কারণ হিসাবে অধিকাংশই (৭৩%) বলেছে তাদের ল্যাট্রিন সম্প্রতি বসানো হয়েছে তাই এখনও ব্যবহার করা শুরু করেনি, ১৬% বলেছে ল্যাট্রিন বসানো হয়েছে মেহমানদের জন্য। যারা এ কথা বলেছে তাদের অধিকাংশই ব্র্যাকের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

দেখা যায়, প্রায় সমান সংখ্যক মহিলা পুরুষ স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, তবে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কম সংখ্যক কিশোরীরা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। শতকরা ৩২টি খানার ল্যাট্রিন শুধু পানি দ্বারা পরিস্কার করা হয়। মাত্র এক ভাগ ব্লিচিং পাউডার, মাত্র ১.৫ ভাগ হারপিক, ৩০.৪ ভাগ ফিনাইল দিয়ে ল্যাট্রিন পরিস্কার করে। শতকরা ৭৪ জন জানিয়েছেন তারা ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি'র স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছ থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ পেয়েছে। স্বল্প সংখ্যক খানা (৭%) রেডিও, টেলিভিশন ও আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে। মল ত্যাগের পর হাত পরিস্কার করার জন্য শতকরা ৩৫টি খানার সদস্যরা সাবান ব্যবহার করে, ১৬ ভাগ ছাই, ২৯ ভাগ মাটি এবং শতকরা ২১ ভাগ শুধু পানি ব্যবহার করে।

স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন এবং এর যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করতে হবে।

অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা[২৬]

আব্দুলাহের হাদী, সমীর রঞ্জন নাথ ও এ এম আর চৌধুরী

আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। অসুস্থতার জন্য একজন শ্রমিকের একটি কর্ম দিবস নষ্ট হলে তিনি তার একদিনের আয় হতে বঞ্চিত হন। কিন্তু এভাবে একজন সুস্থ ব্যক্তির শ্রমদিবস নষ্ট হয় না বরং অতিরিক্ত শ্রম দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আয় করতে পারেন। সুস্থ থাকতে হলে প্রয়োজন স্বাস্থ্য পরিচর্যার। তাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিচর্যার একটি যোগসূত্র রয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দারিদ্র দূরীকরণের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীই বেশি অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর লোকদের রোজগার যেহেতু শ্রম নির্ভর তাই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হলে আয় বাড়বে ও দারিদ্র হ্রাস পাবে, এটাই স্বাভাবিক। স্বাস্থ্যোন্নয়ন মৃত্যুহার হ্রাস করে। তবে মৃত্যুহার হ্রাসকরণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠনের প্রসার ঘটেছে অনেক। পলীর জনগণের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তারা তাদেরকে জড়িত করেছে বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকাণ্ডে। আর এজন্য দিচ্ছে ঋণ। এ সকল কর্মকাণ্ড স্বাস্থ্য উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখে কিনা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কিংবা সুস্বাস্থ্য দরিদ্রদের আর্থিক উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখে তা দেখার জন্য ১৯৯৬ সালে ব্র্যাক এ গবেষণাটি হাতে নেয়।

সমাজ জীবনে মানুষের স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক পরিবর্তন নির্ণয়ের জন্য ব্র্যাকের 'ওয়াচ' নামক একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ১০টি জেলার ৭০টি গ্রামে চালু আছে। 'ওয়াচ' অন্তর্ভুক্ত সকল জেলার ৮২০টি খানা প্রধানদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহন করা হয়।

বিগত আড়াই দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রায় স্থবির হয়ে আছে। তেমন উলেখযোগ্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ পলী এলাকায় হয়নি। যাও কিছু হয়েছে তা স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠনগুলোর জন্য হয়েছে, যেমন ঋণ দিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ। তবে সরকার ও এনজিওদের হস্তক্ষেপে জন্মশীলতা বৃদ্ধি ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং যথাসময়ে শিশুদের টীকাদান সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের পেছনে রয়েছে প্রতিরোধমূলক কতিপয় ব্যবস্থা যেমন, মুখে খাওয়ার স্যালাইন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি।

আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কিভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের বিষয়টি প্রভাব ফেলে তা এ সমীক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় না হলেও দেখা যায় যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রমজীবীরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি মজুরীর কাজ পায়। তাদেরই অধিক কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে ও আয় হ্রাস পেয়েছে যাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও যারা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত। দেখা গেছে, অসুস্থ ছেলে-মেয়ে

[২৬] "Does health development improve socioecoomic well-being in less developed communities?" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৬)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নূরজাহান আকতার সেতু।

স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করে এবং ধীরে ধীরে শিক্ষাহীন হয়ে বড় হয়, যা এদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রয়াস এনজিও কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা। কারণ এনজিওদের রয়েছে কতিপয় নির্দিষ্ট কর্মপন্থা, যেমন- দলগঠন, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহ যোগান ও স্বাস্থ্য বিধান ইত্যাদি অন্যতম। ফলে দরিদ্র জনগণ একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হতে পারছে। সামাজিকভাবে এখন তারা বিচ্ছিন্ন নয়। সংগঠিতভাবে তারা এখন তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারছে।

দেখা যায়, স্বাস্থ্য সেবা তথা সুস্বাস্থ্য দরিদ্র জনগণের শ্রমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড জনগণের গতিশীলতা, আয় ও আর্থিক নিশ্চয়তা বিধানে সহায়তা করে যা পরিণামে স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

তা বলা যায়, স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ দারিদ্র দূরীকরণে, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সম্মানজনকভাবে গৃহীত একটি কৌশল।

দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষমতায়ন ঃ ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন[২৭]

আ. মু. মুয়াজ্জাম হুসেইন, দেবদুলাল মলিক, শান্তনা রানী হালদার, ফেহমীন ফরাশউদ্দীন, আলতাফ হোসেন, শাহনাজ আকতার, দিলরুবা বানু ও নূরুল আমিন

ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি যা ১৯৮৬ সালে চালু করা হয়। এ কর্মসূচি রুরাল ডেভেলোপমেন্ট প্রোগ্রাম বা আরডিপি নামে পরিচিতি। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষমতায়নের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড এ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

আরডিপি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে বিশেষ করে কতটুকু দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে তা মূল্যায়ন করার জন্য এটি ব্র্যাকের দ্বিতীয় সমীক্ষা (প্রথম সমীক্ষার সার-সংক্ষেপ নির্যাস-এর ৫ম সংখ্যায় দেখুন)। এ সমীক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরুপণের মাধ্যমে কর্মসূচির মান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা গেছে যে, গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের শতকরা ৮৫ জনই ঋণ পেয়েছে। যারা ঋণ পায়নি তাদের মধ্যে ৮৭% ই নতুন সদস্য। প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার সম্পর্কে দেখা গেছে যে, আরডিপি ঋণের শতকরা ৮০ ভাগই উৎপাদনমুখী খাতে অথবা সম্পদ ক্রয় এবং গৃহ উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়েছে। শতকরা ২৬ ভাগ সদস্য ব্র্যাক থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা সদস্য পদের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ৮০% এর উপকারিতার কথা ব্যক্ত করেছে তবে সদস্য পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ব্যাপারে কিছু বিরূপ ধারণাও লক্ষ্য করা গেছে।

সদস্যদের আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে আরডিপি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ব্র্যাকে যোগদানের পূর্বে যেখানে ২৮% মহিলা সদস্য আয়মূলক কাজে নিয়োজিত ছিল সেখানে বর্তমানে প্রায় ৪৫% সদস্য বিভিন্ন আয়মূলক কাজে নিয়োজিত। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সদস্য পদের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়মূলক কাজ অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্যদের সম্পদ বৃদ্ধিতে আরডিপি গুরুত্বপূণ ভূমিকা রেখেছে। ফলাফলে দেখা গেছে যে, সদস্যপদের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে সদস্যদের সম্পদের পরিমাণ (জমি বাদে) বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ সদস্যপদের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে দেখা গেছে যে, অন্যদের তুলনায় সদস্যগণ মাথাপিছু অনেক বেশি ক্যালরি গ্রহণ করছে। তাছাড়া খাদ্য ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাতে এদের খরচও অনেক বেশি।

[২৭] "Poverty alleviation and empowerment: an impact assessment study of BRAC's rural development programme" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

সদস্যপদের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্যগণ অধিকতর পরিমাণ শাক, সবজি, মাছ, মাংসসহ অন্যান্য বেশি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে।

স্কুলে যাবার বয়স উপযোগী শিশুদের মধ্যে ব্র্যাক সদস্য খানার ১৮% এবং তুলনাযোগ্য খানার ৮% শিশু ব্র্যাক স্কুলে যায়। ব্র্যাক সদস্য খানাগুলো অন্যদের তুলনায় থালা বাসন ধোয়া, কাপড় কাঁচা এবং গোছলের জন্য নলকূপের পানি বেশি ব্যবহার করে। অবশ্য উভয় শ্রেণীর খানাই ৯৫% এর বেশি ক্ষেত্রে নলকূপের পানি পান করে। সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হারও ব্র্যাক সদস্যদের ক্ষেত্রে বেশি। প্যানেল উপাত্তও উপরোক্ত ফলাফলকে সমর্থন করে।

ব্র্যাকভুক্ত খানার ৫২% এবং তুলনাযোগ্য খানার ৬৯% দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। চরম দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে ব্র্যাকভুক্ত ২৭% এবং অন্যান্যদের ৩৭% খানা। অর্থাৎ ব্র্যাক সদস্য খানাগুলোতে দারিদ্রের ব্যাপকতা ও গভীরতা অন্যদের তুলনায় কম। বিগত বছরে এরা অন্যদের তুলনায় কম খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে।

ব্র্যাক সদস্যখানাগুলোতে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়াতার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। ভরা ও মন্দা মৌসুমে খাদ্য মুদের পরিমাণ বেশি এবং সংকট মোকাবেলায় এরা সেসব কৌশল কম ব্যবহার করেছে যা তাদের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করতে পারে।

ব্র্যাকে যোগদানের ফলে অনেক মহিলা আয়মূলক কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া অনেকে নতুন ধরনের কাজে যোগদান করেছে যেগুলো সাধারণত: তারা আগে করত না। এ সবের ফলে মহিলাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারা তাদের অর্জিত আয়ের অর্থে ব্যক্তিগত সামগ্রী ও পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে।

দেখা গেছে যে, সম্পদের মালিকানা নতুনদের চাইতে পুরাতন সদস্যদের বেশি। সম্পদের উপর মালিকানা প্রায়ই আংশিক, তবে মালিকানা যাই হোক না কেন সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ তাদের সীমিত। সীমিত নিয়ন্ত্রণের কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, কেবলমাত্র গুটিকয়েক সম্পদ ছাড়া অন্যান্য সম্পদকে মহিলারা এখনও খানার সম্পদ বলে মনে করে। ব্র্যাকের কর্মসূচি মহিলাদের আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে এবং মানিসক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। যার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে।

সদস্যদের সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কগুলো ছিল এদের নেতৃত্ব, দক্ষতা ও উদ্যোগের মত বিশেষ গুণাবলী এবং অধিক হারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি। একই সাথে আত্মীয়তা বন্ধনের সুযোগসহ একাধিক সদস্যের ঋণ ব্যবহার এবং আয়মূলক কাজে বেশি অংশগ্রহণও তাদের সাফল্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

সদস্যপদ প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে ৮৫% স্বেচ্ছায় সদস্যপদ ত্যাগ করেছে এবং ১৫% সদস্যপদ ব্র্যাক কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে। ব্র্যাক ত্যাগকারী সদস্যরা সবাই এক ধরনের ছিলনা। জীবন যাপনের মান ও সাফল্যের মাপকাঠির বিচারে তাদর মধ্যে বেশ বড় ধরনের পার্থক্য ছিল। এরা ব্র্যাক ত্যাগের একাধিক কারণ উলেখ্য করেরেছে। তার মধ্যে রয়েছে আয়মূলক কাজে আর্থিক ক্ষতি, নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ

করতে না পারা, কিস্তির জন্য সঞ্চয় তুলতে না পারা, ব্র্যাক কর্মীর দুর্ব্যবহার, সদস্যদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং অন্য এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ততা।

ব্র্যাকের কর্মসূচিতে দরিদ্রতমরাও মোটামুটি আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণায় দেখা যায় যে, দরিদ্রমত খানাগুলোকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ব্র্যাকের সাফল্য গ্রামীণ ব্যাংক অথবা সরকারের আরডি-১২ কর্মসূচির তুলনায় বেশি। চরমদরিদ্র খানাগুলো অনেক সময় উন্নয়ন কর্মসূচিতে সদস্যপদ গ্রহণে অপারগ হয় অথবা সদস্যপদ ছেড়ে দেয়। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, অনেকে সদস্য হয় না এই আশংকায় যে তারা নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দিতে পারবে না অথবা ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে পারবেনা। অনেক পরিবারে পুরুষ উপার্জনকারী সদস্যদের অভাব থাকাতে ঋণ ব্যবহারে এবং কিস্তি প্রদানের অসুবিধা দেখ দেয়। এছাড়া কেউ কেউ মনে করে যে, একবার সদস্য হলে সমিতি ছেড়ে যেতে অসুবিধার হবে আর সমিতিতে তাদের সঞ্চয়ের টাকা রাখা নিরাপদ নয়। আবার এটাও দেখে গেছে যে, সমিতির সদস্যরা এসব লোককে তাদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, ফলে তারা সদস্য হতে পারে না।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। যারা সদস্য নয় সেসব দরিদ্রদের তুলনায় ব্র্যাক সদস্যদের সম্পদের পরিমাণ (জমি বাদে) প্রায় পাঁচগুণ বেশি। খাদ্য গ্রহণ, বাসস্থানের মান, স্বাস্থ্য সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও এদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভাল।

তবে, সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কর্মসূচির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মসূচির বহুমুখীতা বজায় রেখে এর বিভিন্ন অংগ কর্মসূচিকে চাহিদার নিরিখে ঢেলে সাজানোর পদ্ধতি চালু রাখতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার কতে হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক পদ্ধতি আরও সহজতর করার পথ উদ্ভাবন করতে হবে।

আর্সেনিক পরীক্ষায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী[২৮]

মোশ্‌তাক চৌধুরী, মো. যাকারিয়্যা, মো. আশিকুল হাসিব তারেক ও জালালউদ্দিন আহমেদ

পানিতে আর্সেনিক দূষণ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাতে একটি ব্যাপক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের একটি প্রাথমিক পর্যায় হলো পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয়। নলকূপের পানিতে আর্সেনিক পরীক্ষায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে ব্র্যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করছে। এই প্রবন্ধে ব্র্যাকের ভূমিকার কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আর্সেনিক এক প্রকার ধাতব মৌল যা প্রকৃতিতে কখনই মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। যদিও পানিতে আর্সেনিক সহজেই দূরীভূত হয় তথাপি সব ধরনের পরিবেশেই আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক উপস্থিতির সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই তথাপি একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হলো অধিক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে মাটির নিচের এক ধরনের খনিজ পাইরাইট জারিত হয়ে আর্সেনিক মুক্ত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে যোগ হচ্ছে।

যে কোন পানিতে কিছু না কিছু মাত্রায় আর্সেনিক আছে। প্রাকৃতিক পানিতে এর পরিমাণ প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম থেকে ০০২ মিলিগ্রাম এর মধ্যে উঠানামা করে। বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পানযোগ্য পানিতে আর্সনিকের নিরাপদ মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার, কিন্তু সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা হলো ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি হলেই মানুষের শরীরে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পেতে দীর্ঘ ৮-১৪ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সালে চাপাই নওয়াবগঞ্জ জেলার আটঘরিয়া ইউনিয়নে আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য জেলায় নলকূপের পানি পরীক্ষার মাধ্যম এই সমস্যার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিককালে পানিতে আর্সনিকের উপস্থিতির ফলে নলকূপের পানি আর নিরাপদ নয়, বিশেষ করে যেসব এলাকার পানিতে বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ হয়েছে। ব্র্যাক এই সম্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। আর্সেনিকের প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং বিস্তৃতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ব্র্যাক দুই ধরনের গবেষণা প্রকল্প হাত নিয়েছে। প্রথমতঃ সারা দেশে বিস্তৃত ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর নলকূপে পানি পরীক্ষা করা; এবং দ্বিতীয়তঃ একটি থানার সবগুলো নলকূপের পানি পরীক্ষা করে সেগুলোতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয় করা। এক দু'টি গবেষণা কার্যক্রম ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ব্র্যাকের এই কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ব্রাকের এই কার্যক্রমের জন্য 'নিপসম' কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফিল্ড কীট ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[28] "Village health workers can test tubewell water for arsenic' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৮)।

ব্র্যাক এলাকা অফিসের ৮০২টি এবং চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানার ১১,৯৫৪টি নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। পরবর্তীতে হাজিগঞ্জ থানার ১৯৩টি নলকূপের পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিলা্ গবেষণাগারে স্পেকট্রোফটোমিটারে সাহায্যে পুনঃপরীক্ষা করা হয়।

ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠক এবং স্বাস্থ্যসেবিকাদের জন্য ফীল্ড কীট ব্যবহারের উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে কর্মসূচি সংগঠকগণ তাদের নিজেদের কর্মস্থলের আশেপাশে অবস্থিত ব্র্যাক অফিসের নলকূপের পানি পরীক্ষা করেছে। অন্যদিকে চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানায় স্বাস্থ্য সেবিকাগণ তাদের নিজ নিজ গ্রামের নলকূপের পানি পরীক্ষা করার কাজে নিয়োজিত ছিল। এই সমস্ত স্বাস্থ্য সেবিকাগণ সাধারণতঃ গ্রামের অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত দরিদ্র মহিলা যারা ব্র্যাকে কর্তৃক কিছু সাধারণ রোগ-ব্যাধি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

সর্বমোট ৪৫ জন স্বাস্থ্য সেবিকা এবং স্বাস্থ্যসেবক হাজিগঞ্জে নলকূপ পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আনুমানিক এক মাসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছিল এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিটি নলকুপের পানি পরীক্ষায় সর্বমোট খরচ হয়েছিল ১৮ টাকা।

ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়র অফিসের নলকূপ

সারা দেশে বিস্তৃত ব্র্যাকের অফিসগুলো ৮০২টি নলকূপের মধ্যে ৯৪টির পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ছিল গ্রহণযোগ্য মাত্রার (০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার) চেয়ে বেশি। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা গেছে।

হাজিগঞ্জ থানার নলকূপ

হাজিগঞ্জে ১১,৯৫৪টি নলকূপের পানির মধ্যে মাত্র ৮৫৯টি নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত ছিল। বাকী নলকূপগুলো বা ৯৩% নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর চেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। যদিও হাজিগঞ্জের ১১টি ইউনিয়নের সব কয়টিতেই টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি তথাপি দুইটি ইউনিয়নে প্রায় সকল নলকূপে (৯৯) বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নলকূপগুলোর পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৫৩% গ্রামে এমন কোন নলকূপ নেই যার পানি আর্সেনিক দূষণমুক্ত

আমাদের দেশে অধিকাংশ খাবার পানি সংগ্রহ করা হয় ভূগর্ভস্থ পানির আধার থেকে নলকূপ বা গভীর নলকূপের সাহায্যে। এবং দেশে এই ধরনের নলকূপের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ২৫ লক্ষ। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির অপরিমিত ব্যবহার, সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার অভাব, ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে অপর্যাপ্ত পানি সঞ্চয়ন, ইত্যাদি কারণে সারা দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। ব্র্যাকের আর্সেনিক পরীক্ষা কার্যক্রম থেকেও এই অবস্থার যথার্থতা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, হাজিগঞ্জের মত আরো অনেক

এলাকায় আর্সেনিক একটি ভয়াবহ সমস্যা। এই অবস্থা থেকে দ্রুত পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন হলোঃ জরুরী ভিত্তিতে আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপগুলি চিহ্নিতকরণ, মারাত্মকভাবে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্সেনিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পানি থেকে আর্সেনিক অপসারণের জন্য এখন পর্যন্ত সহজে ব্যবহারযোগ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী কোন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি।

ব্র্যাকের আলোচ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, গ্রামের দরিদ্র এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মহিলাগণ স্বল্প সময়ে এবং খুব কম খরচে নিজের এলাকায় নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণ করতে সক্ষম।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ নির্গমন ঃ একটি পরিবেশগত সমীক্ষা[২৯]

নাসিমা আক্তার, রিচেল ই একট, এম জি সাত্তার ও সাদিয়া এ চৌধুরী

হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ বলতে সাধারণত: যা বুঝায় তা হল ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত ধারাল সুঁই, বেড়ু,ক্ষুর, সিরিঞ্জ, ভায়াল, রক্ত সংগ্রহের টিউব, গজ, ব্যাণ্ডেজ, অনুজীব কালচার করার ডিশ, টিউব, মিডিয়াম, বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণের এজেন্ট, সংক্রামিত কাশি, রক্ত, মল-মুত্রের নমুনা এবং পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ও সরঞ্জামসমূহ।

বাংলাদেশে হাসপাতাল বর্জ্য একটি উপেক্ষিত বিষয়। হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ বা নির্গমনের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। বর্জ্যগুলো আসে হাসপাতাল, মেডিকেল স্কুল, ক্লিনিক, প্যাথলজিকেল পরীক্ষাগার এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলো থেকে। বর্জ্য পদার্থের অপরিকল্পিত নির্গমনের ফলে আমাদের আশেপাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শের কারণে মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, মাটি, পানি এবং সর্বোপরি বাতাসও দূষিত হচ্ছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংক্রামক অনুজীব, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে খাদ্য শৃংখলে প্রবেশ করে। এবং এইভাবে হাসপাতালের বর্জ্য ক্রমান্বয়ে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্র্যাকের পরিবেশ গ্রুপ ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থের নির্গমনের উপর একটি সমীক্ষা চালায় ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল হাসপাতাল বর্জ্য নির্গমন এবং ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের সচেতনতা নিরূপণ করা এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব কমানোর জন্য উন্নততর ব্যবস্থাপনার সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং কর্মী, রোগী সুবিধাভোগী ও আশেপাশের গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রসবকক্ষ এবং পরীক্ষাগারে বিপদজনক বর্জ্য তৈরি হয়। হাসপাতাল বর্জ্য সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মী বা সুবিধাভোগীদের সচেতনতা খুবই নগণ্য। এই সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বর্জ্য পদার্থ নির্গমনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ স্পুটাম পটসহ প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য পুড়ানো, পচনশীল বর্জ্য গর্ত করে মাটি চাপা দেয়া বা কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে গর্ত করে সেখানে সব ধরনের বর্জ্য এক সাথে ফেলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাটি চাপা দেয়া বা পুড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরীক্ষাগারের বর্জ্য পানি বা তরল নির্গমনেও তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। সাধারণত: পরীক্ষণীয় নমুনার অবশেষসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত পানি বেসিনে ফেলা হয় যেখান থেকে সরাসরি বাইরে ফেলা হয় অথবা ড্রেনের সাহায্যে খোলা গর্তে, নালায় ফেলা হয়। সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ফল পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ল্যাব-টেকনিশিয়ান এবং

[29] "Medical waste disposal at BRAC health centres: An environmental study" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)।

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত xylene, phenol সহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের অসচেতনভাবে ব্যবহার ও বর্জ্য নির্গমনের ফল এর সংস্পর্শে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা এমনিক কিডনি বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও আরও লক্ষণীয় যে, হাসপাতাল বর্জ্য কিভাবে নির্গমন এবং ব্যবস্থাপনা করতে হবে এ সম্বন্ধে কর্মীদের কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরীক্ষাগার, প্রসব কক্ষ এবং যক্ষ্মার বর্জ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর যে সমস্ত ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলির মধ্যে মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্রমবৃদ্ধি পানি দূষণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহানী, আবাসন ধ্বংস, বায়ু দূষণ এবং জনসাধারণের বিরক্তি সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

এই সমীক্ষায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তার জন্য কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ব্র্যাকের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিভাগ প্রণিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নীতিমালার ব্যবহার, ক্লোজ মনিটরিং করা এবং সুপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য – যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সমস্যা কমানোর জন্য অবশ্য করণীয়।

সুপারিশমালার মধ্যে যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজযোগ্য সেগুলো হল, সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিকল্পিত বর্জ্য নির্গমনের স্থান নির্বাচন, জৈব পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের জন্য পৃথক গর্ত করা xylene এর ব্যবহার বন্ধ করা, বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ ব্যবহার (বিভিন্ন রঙের পলি ব্যাগে বর্জ্য পদার্থ আলাদা রাখা), সংক্রামক এবং বিপদজনক রাসায়নিক নিয়ে যারা কাজ করে তাদের জন্য স্বাস্থ্য-ঝুঁকি ভাতার প্রচলন, ইত্যাদি। ক্রমান্বয়ে আরো যেগুলো করা প্রয়োজন সেগুলো হল phenol এর ব্যবহার বন্ধ করা (বিকল্প জীবাণুনাশক ও অটোক্লেভ ব্যবহারে মাধ্যমে, বর্জ্য পোড়ানোর জন্য ইনসিনেরেটর ব্যবহার করা এবং কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলন কর।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকারিতা[৩০]

সুহেলা হক খান, শাহনূর মাহমুদ, এ এম আর চৌধুরী, ফজলুল করিম ও কাওসার আফসানা

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা 'সুস্বাস্থ্য' উলেøখযোগ্য। 'সুস্বাস্থ্য'-এর মাধ্যমে ব্র্যাক জনগণের মধ্যে প্রাথমিক ও মধ্য পর্যায়ের দীর্ঘমেয়াদী সেবা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। সেবাপ্রদানকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফী'র মাধ্যমে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আর্থিক সংস্থান বজায় রাখার উপ বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এবং এই দিকটি যাচাই করার জন্য এ গবেষণাটি করা হয়।

গবেষণাটি করা হয় ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির তিনটি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, বগুড়া ও দিনাজপুর) নয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আর্থিক সংস্থান যাচাই কার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা হয়, যেমন খরচ, আয় ও প্রভাব ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে এ গবেষণার তথ্য কর্মসূচির রেকর্ড/রেজিস্টার, সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালাতে বছরে গড়ে খরচ হয়েছে ৪,২২,০৯২টাকা, এবং এর মধ্যে নির্বাহী (recurrent cost) খরচ গড়ে ৪,০৩,৫৪৭ টাকা এবং মূলধন খরচ (capital cost) গড়ে ১৮,৫৪৫ টাকা। প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাৎসরিক আয় গড়ে ৮৯,৬৩১ টাকা। এই আয় থেকে নির্বাহী (recurrent cost) খরচের ২২% উসুল হয় (recovery) এবং মোট খরচের (total cost) ২১% উসুল হয় (শুধু যদি ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির ব্যবহার্য সূচকগুলি বিবেচনা করা হয় তবে চলমান/নির্বাহী খরচের ৩৫% উসুল হয় এবং মোট খরচের ৩৩% উসুল হয়)। প্রতি রোগীর পিছনে ব্যয় হয়েছে ৯৩ টাকা।

গত এক বছরে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যে সকল সাধারণ রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ স্ত্রীরোগ। কিছু কিছু সেবা যেমন, প্রসব-পূর্ব পরিচর্যা ও গ্রোথ মনিটরিং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করতে খরচ কম পড়েছে পূর্বের কম্যুনিটি ভিত্তিক সার্ভিসের তুলনায়।

বর্তমান খরচ উসুলের ভিত্তিতে বলা যায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র তার ২১% আর্থিক সংস্থান বজায় রাখতে পারছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে যত রোগী আসে তা যদি সাড়ে চার গুণ বাড়ানো যায় তাহলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী খরচ উসুল হবে ১০০%। এই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তৃণমূল পর্যায়ে খুব কম খরচে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য আংশিকভাবে আর্থিক সংস্থান বজায় রাখতে পারছে এবং এটা স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক (replicable) মডেল হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

---

[30] "Financing the BRAC health centres: their financial sustainability and cost-effectiveness" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ১ মার্চ ১৯৯৫

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সাইক্লোনোত্তর পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন

দরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের গৃহায়ণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

গ্রাম সংগঠনগুলোকে নিয়ে ফেডারেশন গঠন: কিছু অভিমত

ব্র্যাকের প্যারালিগ্যাল কর্মসুচি: একটি সমীক্ষা

আরডিপিভুক্ত গ্রাম সংগঠনের বিষয়ভিত্তিক সভা

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: একটি কোর্সের মূল্যায়ন

মাসিক রক্তস্রাব: কিশোরী মেয়েদের বিশ্বাস ও আচরণ

ভূমিহীনদের মালিকানায় সেচ ব্যবস্থা ও সমাজে তার প্রভাব

পল্লী এলাকায় সাক্ষরতা: এনএফপিইভুক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুলে কেমন করছে

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: গ্রামের একটি স্কুল সমীক্ষার ফলাফল

পল্লীর দরিদ্র মানুষের জীবনে মৎস্যচাষের প্রভাব

পল্লীর দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া

পূর্বেকার যৌথ ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণ

বাংলাদেশে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা: একটি মূল্যায়ন

আইজিভিজিডি কর্মসচির প্রভাব: একটি উপজেলায় পোল্ট্রি কর্মীদের কার্যক্রমের সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা: শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ

স্বাস্থ্যসেবিকাদের কাজের একটি মূল্যায়ন

মহিলাদের গর্ভধারণ এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহার

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে মাদ্রার্স ক্লাবের প্রভাব

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রচলিত নাম

পল্লী এলাকায় চাল-লবণের তৈরী খাবার স্যালাইনের ব্যবহার

খণ্ড ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

পল্লী এলাকার কয়েকটি অবহেলিত স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে শিশুদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন

এনএফপিই শিক্ষকদের ইংরেজী ও অংক বিষয়ক পারদর্শিতা এবং অন্যান্য বিষয়

দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রামীণ নারী: ছয়টি সমীক্ষা

আইজিভিজিডি ও ভিজিডি কর্মসূচিভুক্ত শিশু-কিশোর ও মায়েদের উপর অপুষ্টির প্রভাব

বৈবাহিক সম্পর্ক ও নারী নির্যাতন: একটি সমীক্ষা

কিশোরী মেয়েদের দৃষ্টিতে বিবাহ

গ্রামীণ মহিলাদের আয়মূলক কাজের ব্যবস্থাপনা: মির্জাপুর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক সমিতি: সমষ্টির অংশগ্রহণ না কতিপয়ের নিয়ন্ত্রণ

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়ন

জেলে পরিবারে নারী: বাওর এলাকার চিত্র

স্বাস্থ্য বিষয়ক

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের ভূমিকা ইতিবাচক অবদান রাখবে: একটি প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য শিক্ষা কি গ্রামীণ জনসাধারণকে অধিক স্বাস্থ্য সচেতন করতে পেরেছে?

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মৃত্যুহার কমানোর উপর ব্র্যাকের কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপর একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উপর আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রভাব

ব্র্যাকের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সুরুচি রেঁস্তোরার ব্যবস্থাপনা: মহিলাদের একটিব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস

শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর একটি জরিপ

দরিদ্রদের আইনি জ্ঞান: নির্বাচিত বেসলাইন তথ্য

ব্র্যাকের রেশম চাষ প্রকল্প: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে জমির মালিকানা এবং ভোগ দখলের ধরন: একটি গ্রাম সমীক্ষা

মানিকগঞ্জের গিলন্ডা গ্রামে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন দক্ষতার জ্ঞানের উপর কয়েকটি

বাছাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব: একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে দেয়?

স্বাস্থ্য বিষয়ক

গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের উপর একটি মূল্যায়ন

গর্ভবতী মহিলাদের সেবা প্রদানে ব্র্যাকের ভূমিকা

সন্তান প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা

গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা

স্বাস্থ্য ও মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন নির্ণয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি: একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি: প্রতিদ্বন্দ্বিতা না সহযোগিতা?

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি ও দারিদ্র্য

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব

দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিম্ন পর্যায়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগকে বেছে নেয়াই কি উত্তম?

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কী এ কর্মসূচির কাজকে বোঝা মনে করে?

সরকারি কর্মী, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

খণ্ড ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

সম্পাদকীয়: রজত জয়ন্তী সংখ্যা

ব্র্যাক গবেষণার একুশ বছর: কিছু প্রাসংগিক কথা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন

গ্রামীণ জনগণের সমস্যা মোকাবেলা ও বেঁচে থাকার কৌশল

মতলব থানায় ব্র্যাকের দু'টি স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার উপর একটি সমীক্ষা

মোরগ-মুরগী পালনে ভূমিহীন দরিদ্র নারী সমাজ: পাঁচটি গ্রামের চিত্র

ব্র্যাকের মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের অর্থপুষ্ট প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি: মতলব এলাকার সাতটি ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনভুক্ত পাঁচ জন মহিলা সদস্যার সাফল্যের খতিয়ান

সদস্যদের গ্রাম সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণ: একটি সমীক্ষা

গ্রাম সংগঠন গঠন প্রক্রিয়ার উপর একটি পর্যবেক্ষণ

গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা: জামালপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রামের একটি চিত্র

কাজের সময়, আয় ও ব্যয়ের ঋতু ভিত্তিক তারতম্য: একটি সমীক্ষা

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অপ্রচলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

মহিলা প্রধান খানায় কী কী কারণে মহিলারা ঝুঁকির সম্মুখীন হন

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মতলব এলাকার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের বেজলাইন জরিপ

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মায়েদের ধারণা

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের পুষ্টিহীনতা: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

ব্র্যাকের পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন

ব্র্যাকের 'ওয়াচ' প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি গবেষণা

স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রয়: সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

যৌনব্যাধি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা: দু'টি এলাকার চিত্র

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক একটি মূল্যায়ন

খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ মায়েরা কতদিন মনে রাখতে পারেন?

ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুর কারণ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা

পল্লী এলাকায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু হারে পরিবর্তন

ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি: চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের উপর একটি সমীক্ষা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার উপর একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৫ নভেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব: একটি বিশেষ সমীক্ষা

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা: একটি সমীক্ষা

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব: ঝিকরগাছা এলাকার চিত্র

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির প্রভাব: জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামের চিত্র

মহিলা প্রধান খানার সমস্যাসমূহ

গ্রাম সংগঠন সদস্যদের সঞ্চয়ী অর্থের ব্যবহার

নারী পুরুষ সম্পর্কের উপর মহিলাদের মজুরীভিত্তিক কাজ ও ঋণের প্রভাব

ঋতুভেদে গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য: একটি সমীক্ষা

লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে আরআরএ পদ্ধতি প্রয়োগ: লালমনিরহাট সদর থানার একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম

সাক্ষরতার প্রসার: মানিকগঞ্জে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা

ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে ভর্তি অবস্থা: প্রেক্ষিত গ্রাম বাংলা

ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণ: ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী: ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সমাজ

পাঁচ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা

মায়েদের টিকাদান সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখে?

পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব

পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকায় দম্পতিদের পছন্দ

জন্মশীলতা পরিবর্তনে গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারে পরিবর্তন

খণ্ড ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

সম্পাদকীয়

নির্যাস পাঠক জরিপ: মাঠ পর্যায়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন

ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প: পরিবেশগত একটি সমীক্ষা

মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এ আরডিপি'র ঋণ বিতরণের চিত্র

ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

আরডিপি'র মাসিক সভা: মতলবের দশটি গ্রাম সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল: ব্র্যাক কর্মসূচিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়

গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে জটিলতা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েদের অর্জিত মৌলিক দক্ষতার মূল্যায়ন

গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার: ব্র্যাকের ভূমিকা

গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পুনর্ব্যবহার: একটি সম্ভাব্যতা যাচাই

স্বাস্থ্য বিষয়ক

জাতীয় টিকা দিবসের সংগঠন এবং বাস্তবায়ন: ১৯৯৬ পর্বের একটি মূল্যায়ন

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচির মূল্যায়ন

ব্র্যাকের এআরআই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ

মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা

প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডকৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন

প্রসব-পূর্ব সেবায় কর্মসূচি সংগঠকের ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনা: একটি সমীক্ষা- গ্রামের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর ধারণা

গ্রামীণ এলাকায় প্রসব পরবর্তী সময়ে জন্মনিরোধক ব্যবহারের ধরন

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব

পুষ্টি উন্নয়নে পরিপূরক খাবার: মুক্তাগাছা পাইলট প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন

পরিপূরক খাবার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা: মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের একটি পাইলট সমীক্ষা

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ল্যাট্রিন বিক্রয় কতটুকু ফলদায়ক?

অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা

ব্র্যাকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৭-৯৮)

দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন: ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘ

মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন

আর্সেনিক পরীক্ষায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ নির্গমন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকারিতা